দেবী চৌধুরানী

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আলোকিত মানুষ চাই

দেবী চৌধুরানি

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা ১২১

গ্রন্থমালা সম্পাদক
আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ

প্রথম বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র সংস্করণ
আশ্বিন ১৪০১ অক্টোবর ১৯৯৪

তৃতীয় সংস্করণ চতুর্থ মুদ্রণ
ফাল্গুন ১৪২৩ মার্চ ২০১৭

প্রকাশক
মো. আলাউদ্দিন সরকার
বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র
১৭ ময়মনসিংহ রোড, বাংলামটর, ঢাকা ১০০০
ফোন : ৯৬৬০৮১২ ৫৮৬১২৩৭৪ ০১৮৩৯৯০৬৭৫৪

মুদ্রণ
ওমাসিস প্রিন্টার্স
২৭৮/৩ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা ১২০৫

প্রচ্ছদ
ধ্রুব এষ

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

ISBN-984-18-0120-5

DEBI CHOWDHURANI
A novel by Bankim Chandra Chattopadhyay
Introduction by Maruful Islam
Published by Bishwo Shahitto Kendro
17 Mymensing Road, Banglamotor, Dhaka 1000 Bangladesh

Email : bskprokashona@gmail.com www.bsksale.com

Price : Tk. 150.00 only

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে যদিও প্যারীচাঁদ মিত্রের (১৮১৪—১৮৮৩) 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮)-কে গণ্য করা হয়, তবু শিল্পবিবেচনায় এটি সার্থক উপন্যাসের পর্যায়ে পড়ে না। তাই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক উপন্যাসের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের (১৮৩৮—১৮৯৪) প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' (১৮৬৫)। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমগ্র সাহিত্যজীবনে সর্বমোট চৌদ্দটি উপন্যাস রচনা করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পর তাঁর রচিত উপন্যাসগুলো হচ্ছে—কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), মৃণালিনী (১৮৬৯), বিষবৃক্ষ (১৮৭৩), ইন্দিরা (১৮৭৬), যুগলাঙ্গরীয় (১৮৭৪), চন্দ্রশেখর (১৮৭৮), রাধারানী (১৮৭৬), রজনী (১৮৭৭), দেবী চৌধুরানি (১৮৮২) ও সীতারাম (১৮৮৭) । এই চৌদ্দটি উপন্যাসে তাঁর ঔপন্যাসিক প্রজ্ঞা, সৃজনশীল প্রতিভা, প্রাজ্ঞ মনীষা ও অনন্যসাধারণ শিল্পদক্ষতার অনুপম অভিব্যক্তি মুদ্রিত হয়ে আছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসসমূহের জন্য নন্দিত যেমন হয়েছেন, নিন্দিতও হয়েছেন তেমনই। বাংলা সাহিত্যের পাঠক ও সমালোচকদের মধ্যে অধুনা অবধি তাঁকে নিয়ে বির্তকের অন্ত নেই। কেউ কেউ তাঁকে অভিহিত করেছেন 'সাহিত্য-সম্রাট'-এ, আবার অনেকেই তাঁর কপালে এঁকে দিয়েছেন সাম্প্রদায়িকের কলঙ্ক-তিলক। তবু তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১—১৯৪১) মন্তব্যই প্রণিধানযোগ্য। তিনি তাঁকে অভিহিত করেছেন 'সাহিত্যে কর্মযোগী' এবং 'সব্যসাচী' হিসেবে। তাঁর ভাষায়: 'সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কি কাব্য, কি বিজ্ঞান, কি ইতিহাস, কি ধর্মগ্রন্থ—যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা যেখানেই তাঁহাকে আর্তস্বরে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দেখা দিয়াছেন।' এখানেই বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের অবিনশ্বর অবদান। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে তিনি দিয়েছেন যথার্থ শিল্পরূপ, প্রাণের জাদু সঞ্চার করেছেন এর অন্তরে, আপন প্রতিভাবলে একে পৌঁছে দিয়েছেন তুঙ্গস্পর্শী মানে, প্রতিষ্ঠা করেছেন গৌরবোজ্জ্বল মহিমায়।

ঈশ্বর নয়—মানুষ, ধর্ম নয়—মানবতা, ভক্তি নয়—যুক্তি, বিশ্বাস নয়—বিজ্ঞান; জীবনবোধের ক্ষেত্রে এই নতুনতর উপলব্ধি হল বাংলা সাহিত্যের আধুনিক যুগের মর্মবাণী বা মূলমন্ত্র। এই মূলমন্ত্রকে আত্মস্থ ও অঙ্গীকার করেই মধ্যযুগের পাট চুকিয়ে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগের সূচনা ও ক্রমবিকাশ। নতুন জীবনবোধের যথার্থ প্রকাশের জন্য প্রয়োজন নতুন শিল্পরূপের ও নতুন শিল্পরীতির। সেই সূত্র ধরেই আধুনিক যুগে একে একে জন্ম নেয় গদ্যরীতি, প্রবন্ধ, উপন্যাস, নাটক, সাহিত্য-মহাকাব্য, অমিত্রাক্ষর ছন্দ, সনেট, গীতিকবিতা, ছোটগল্প প্রভৃতি। এর মধ্যে বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সার্থক রূপকার। তাঁর উপন্যাসসমগ্রে বাংলা উপন্যাসের উৎস ও ক্রমবিকাশের প্রকৃষ্ট পরিচয় উৎকীর্ণ হয়ে আছে। তাই তাঁকে আখ্যায়িত করা হয় 'বাংলা-সাহিত্যের জনক'

হিসেবে। বাংলা উপন্যাসে 'বৈচিত্র্য-সম্পাদন বঙ্কিমের অবিস্মরণীয় কৃতিত্ব।'

'দেবী চৌধুরানি' বঙ্কিমচন্দ্রের শেষপর্যায়ের উপন্যাস। এতে প্রফুল্লমুখী নামের এক স্বামী-সংসার-পরিত্যক্তা বালিকার শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতোক্ত নিষ্কামধর্মে দীক্ষা নিয়ে সমাজ-সংসার জীবনের বাইরে কঠোর শারীরিক ও মানসিক শিক্ষা-সাধনা-তপস্যার মাধ্যমে দেবী চৌধুরানিতে পরিণত হয়ে ওঠার ইতিহাস শিল্পরূপ পেয়েছে। এই চরিত্রটিকে ঔপন্যাসিক তাঁর আদর্শ নারীচরিত্ররূপে সৃষ্টি করেছেন।

'আনন্দমঠ', 'দেবী চৌধুরানি' ও 'সীতারাম'-এই তিনটিকে একসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ত্রয়ী উপন্যাস' হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। 'একটি বিশেষ দর্শন, যা একান্তভাবে বঙ্কিমেরই সৃষ্টি—'অনুশীলনতত্ত্ব'—তার সার্বিক উপস্থিতি এই তিনটি উপন্যাসকে অবলম্বন করেই লেখক সম্ভব করে তুলেছেন।' তাঁর রাজনৈতিক চেতনা, স্বদেশপ্রেম ও স্বাদেশিকতার বোধের প্রকাশেও এ-তিনটি উপন্যাস সমৃদ্ধ। ফলে, 'সাহিত্যরস আস্বাদনের অতিরিক্ত সামাজিক, রাজনৈতিক ও চৈতন্য-উদ্বোধক সৃষ্টিকর্ম হিসেবে এগুলোর মর্যাদা স্বতন্ত্র।'

'দেবী চৌধুরানি'তে বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্কামধর্মের প্রচারক। তিনি মনে করেন যে, মানুষের প্রবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত না হয়ে, বরং প্রবৃত্তি জয় করা উচিত। তাঁর মতে, 'মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি অছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।' তাই প্রবৃত্তির সামঞ্জস্য বিধান করে মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্য প্রয়োজন অনুশীলনের, নিষ্কামধর্ম সাধনার। এই বোধই এ-উপন্যাসের মূল প্রতিপাদ্য; আর এই বোধেরই প্রতিষ্ঠা দেখানো হয়েছে উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রফুল্ল বা দেবী চৌধুরানির মধ্যে। ভবানী পাঠকের কাছে নিষ্কামধর্মের সাধনা করে প্রফুল্ল 'যথার্থ সন্ন্যাসিনী'তে পরিণত হয়ে সংসারজীবনে এসে একদিকে নিজে যেমন সুখী হয়, অপরদিকে অন্যদেরকেও ততোধিক সুখে পরিপূর্ণ করে তোলে। উপন্যাসে আছে :

'প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারে সকলকে সুখী করিল। শাশুড়ি প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুর প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষে প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভালো লাগিত না। শ্বশুর শাশুড়ি প্রফুল্লকে না-জিজ্ঞাসা করিয়া কোনো কাজ করিত না, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার উপর তাহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল। শেষ নয়ান বৌও বশীভূত হইল। সাগর বাপের বাড়ি অধিক দিন থাকিতে পারিল না—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।'

ঔপন্যাসিক বলেছেন :

'এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য নহে। কেননা, প্রফুল্ল নিষ্কামধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোনো কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ ধর্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোনা হইত।'

প্রকৃতপক্ষে, নিষ্কামধর্মের সাধিকা প্রফুল্লকে আদর্শ নারীচরিত্র হিসেবে চিত্রিত করে উপন্যাসের পরিণামে এই ধর্মের সুফল ফলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এর মহত্ত্ব ও গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। 'দেবী চৌধুরানি' উপন্যাসের প্রেক্ষাপট আঠারো শতকের শেষ পাদের বাংলা। সেই সময়ের একটি মর্মন্তুদ সমাজচিত্র এ-উপন্যাসে অঙ্কিত হয়েছে—'তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে ; ইংরেজের রাজ্য ভালো করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা।' তখনকার সামাজিক অন্যায়-অত্যাচার-অবিচার-নির্যাতন-নিপীড়ন-উৎপীড়নের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষারূপ দিয়েছেন ঔপন্যাসিক: 'কাছারির কর্মচারীরা বাকিদারের ঘরবাড়ি লুট করে, লুকানো ধনের তল্লাশে ঘর ভাঙিয়া মেঝে খুঁড়িয়া দেখে, পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্রগুণ লইয়া যায়; না পাইলে মারে, বাঁধে, কয়েদ করে,

পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে। সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে; স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্বসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়।' আর এ সবের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্র সৃষ্টি করেছেন এ-উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র ভবানী পাঠককে : ভবানী পাঠক দস্যুদলের সর্দার হলেও দস্যুবৃত্তি তার কর্ম নয় ; তার একমাত্র ধর্মকর্ম হচ্ছে— 'দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন।' এই ভবানী পাঠকই অবলম্বনহীন বালিকা প্রফুল্লকে সমাজের মুক্তিকল্পে নিষ্কামধর্মের সাধনার মাধ্যমে পরিণত করে দেবী চৌধুরানিতে।

'দেবী চৌধুরানি' উপন্যাসে রোমাঞ্চধর্মিতা পরিলক্ষিত হয়। এ-উপন্যাসে আঠারো শতকের শেষদিকের বাংলার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনকথা বিধৃত হলেও 'রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার রন্ধ্রপথ' দিয়ে 'সাধারণজীবনের উপর রোমাঞ্চের অলৌকিকত্ব' এসে কখনো-কখনো ছায়াপাত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের মতো এর কাহিনী-নির্মাণেও বহির্জাগতিক ঘটনার ঘনঘটা লক্ষ করা যায়। জীবনের অন্তর্প্রদেশের রহস্য উন্মোচনের চেয়ে জীবনের বহিরঙ্গের প্রতিই অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন লেখক। তাই উপন্যাসের আখ্যানভাগের বর্ণনায় প্রকট হয় ওঠে কড়া রঙ ও চড়া সুরের বিপুল ব্যবহার। তবে, ঘটনাংশে অসাধারণত্ব ও অলৌকিকত্বে এবং অলৌকিকত্বের স্পর্শে কখনো-কখনো রোমাঞ্চের মৃদু আবহ তৈরি হওয়া সত্ত্বেও, চূড়ান্ত বিচারে, কাহিনীর বয়নে ও অন্তর্বয়নে বাস্তবতার প্রাধান্যের কারণে উপন্যাসটি বাস্তবজীবনচিত্র হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে ওঠে। এ-উপন্যাসে ঈষৎ অলৌকিকতার ছোঁয়া ছাপিয়ে 'সামাজিক জীবনের সহজপ্রীতিপূর্ণ, অথচ ক্ষুদ্র-বিরোধ-বিড়ম্বিত চিত্রটিই' প্রধানত ব্যাপ্ত হয়ে আছে।

চরিত্র-সৃজনেও ঔপন্যাসিকের বাস্তবচেতনা ও পরিমিতিবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রফুল্ল নিষ্কামধর্মে দীক্ষা নেওয়া সত্ত্বেও তার 'স্বামী-প্রেমে-বিহ্বলা, আদর্শ গৃহলক্ষ্মীর' রূপটিই প্রধান হয়ে উঠেছে। এই ধর্মদীক্ষা তাকে 'কখনো সন্ন্যাসের দিকে, গার্হস্থ্যধর্মের বিরুদ্ধে প্রবর্তিত' করতে পারেনি। ব্রজেশ্বর চরিত্রেও লেখক 'প্রেম ও পিতৃভক্তির একটি সুন্দর সামঞ্জস্য-সাধন' করেছেন। 'প্রবল, অপ্রতিরোধনীয় প্রেমের মধ্যে পিতৃভক্তির অক্ষুণ্ন মর্যাদা-রক্ষা' তার চরিত্রে একটি দৃপ্ত পৌরুষের উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করেছে। নিশি চরিত্রে 'সন্ন্যাসিনীর গৈরিক-বস্ত্রের নিচে একটি স্বভাবদুর্বল, লজ্জাসংকুচিত' নারীহৃদয়ের স্পন্দন সহজেই অনুভব করা যায়। ভবানীপাঠক চরিত্রেও 'অবিমিশ্র আদর্শবাদ' অনুপস্থিত ; ফলে এই চরিত্রটিও বাস্তবতা হারায়নি। উপন্যাসের অন্যতম বিশিষ্ট চরিত্র হরবল্লভ। চরিত্রটির 'কঠোর বৈষয়িকতা ও নির্মম সমাজানুবর্তিতা' লেখক অত্যন্ত বাস্তবসম্মত বিশ্বস্ততার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন। ব্রহ্মঠাকুরানি, সাগর বৌ, নয়ান বৌ, ব্রজেশ্বরের মাতা, প্রফুল্লের মাতা, সাগরের পিতা, রঙ্গরাজ, ইংরেজ লেফটেনান্ট, দুর্লভ চক্রবর্তী, ফুলমণি, অলকমণি, গোবরার মা সকলেই জীবন্ত চরিত্র। ঔপন্যাসিকের চরিত্র-সৃজন-দক্ষতার কারণে প্রতিটি চরিত্রই বাস্তবানুগ, বিশ্বাসযোগ্য, প্রাণবন্ত ও রক্তমাংসময় হয়ে উঠেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর ভাষা ও বর্ণনার অসামান্য মাধুর্য ও লালিত্য। 'দেবী চৌধুরানি'ও এই অনন্য প্রসাদগুণ বঞ্চিত নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ :

'বর্ষাকাল। রাত্রি জোছনা। জোছনা এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকার মাখা পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মতো। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর স্রোতে, আবর্তে, কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি ; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার ; অন্ধকারে

গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে। আঁধারে আঁধারে, সে বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কল-কল শব্দ, আবর্তের ঘোর গর্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জন ; সর্বসুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।'

বস্তুতপক্ষে, 'বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের কাহিনী-নির্মাণে সুদক্ষ ছিলেন এবং সেদিন থেকে বাংলা উপন্যাসের সামগ্রিক বিস্তারের জন্য তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। যদিও ধর্ম, রাজনীতি এবং সমাজ প্রায়শ তাঁর প্রতিপাদ্য হয়েছে—কিন্তু সেসব সত্ত্বেও এবং সেগুলোর আবর্তের মধ্যে থেকেও তিনি গতিময় উপভোগ্য কাহিনী নির্মাণে সফলকাম হয়েছেন। কুশলী ভাষাশিল্পী হিসেবে বাংলা শব্দকে চরিত্র বিকাশে সবাক এবং তাৎপর্যময় তিনিই প্রথম করেছিলেন। জীবনের জিজ্ঞাসা এবং অনুচ্চারিত বিবিধ আকাঙ্ক্ষার বাহন করে বাংলা ভাষাকে তিনিই সর্বপ্রথম আধুনিক করলেন।' 'দেবী চৌধুরানি' উপন্যাসটি তাঁর এই অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহন করে। চমৎকার কাহিনী বর্ণনায়, অসাধারণ চরিত্র চিত্রণে, অনুপম ভাষাভঙ্গিতে এবং রচনাশৈলীর অভিনবত্বে 'দেবী চৌধুরানি' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি।

মারুফুল ইসলাম
৮/১৭-এ লালমাটিয়া ঢাকা
৩০.০৮.১৯৯৪

প্রথম খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

'ও পি—ও পিপি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী!'

'যাই মা।'

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল। বলিল, 'কেন মা?'

মা বলিল, 'যা না—ঘোষেদের বাড়ি থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।'

প্রফুল্লমুখী বলিল, 'আমি পারব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।'

মা। তবে খাবি কী? আজ ঘরে যে কিছু নেই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা?

মা। যেমন অদৃষ্ট করে এসেছিলি। কাঙ্গাল গরিবের চাইতে লজ্জা কী?

প্রফুল্ল কথা কহিল না। মা বলিল, 'তুই তবে ভাত চড়াইয়া দে, আমি কিছু তরকারির চেষ্টায় যাই।'

প্রফুল্ল বলিল, 'আমার মাথা খাও, আর চাইতে যাইও না। ঘরে চাল আছে, নুন আছে, গাছে কাঁচা লঙ্কা আছে—মেয়েমানুষের তাই ঢের।'

অগত্যা প্রফুল্লের মাতা সম্মত হইল। ভাতের জল চড়াইয়াছিল, মা চাল ধুইতে গেল। চাল ধুইবার জন্য ধুচুনি হাতে করিয়া মাতা গালে হাত দিল। বলিল, 'চাল কই?'

প্রফুল্লকে দেখাইল, আধ মুটা চাউল আছে মাত্র—তাহা একজনেরও আধপেটা হইবে না।

মা ধুচুনি হাতে করিয়া বাহির হইল। প্রফুল্ল বলিল, 'কোথা যাও?'

মা। চাল ধার করিয়া আনি—নইলে শুধু ভাতই কপালে জোটে কই?

প্র। আমরা লোকের কত চাল ধারি—শোধ দিতে পারি না—তুমি আর চাল ধার করিও না।

মা। আবাগীর মেয়ে, খাবি কী? ঘরে যে একটি পয়সা নাই।

প্র। উপস্ করিব।

মা। উপস্ করিয়া কয় দিন বাঁচিবি।

প্র। নাহয় মরিব।

মা। আমি মরিলে যা হয় করিস; তুই উপস্ করিয়া মরিবি, আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। যেমন করিয়া পারি, ভিক্ষা করিয়া তোকে খাওয়াইব।

প্র। ভিক্ষাই বা কেন করিতে হইবে? এক দিনের উপবাসে মানুষ মরে না। এসো না, মায়ে ঝিয়ে আজ পৈতে তুলি। কাল বেচিয়া কড়ি করিব।

মা। সূতা কই?

প্র। কেন, চরকা আছে।

মা। পাঁজ কই?

তখন প্রফুল্লমুখী অধোবদনে রোদন করিতে লাগিল। মা ধুচুনি হাতে আবার চাউল ধার করিয়া আনিতে চলিল, তখন প্রফুল্ল মা'র হাত হইতে ধুচুনি কাড়িয়া লইয়া তফাতে রাখিল। বলিল, 'মা, আমি কেন চেয়ে ধার করে খাব—আমার তো সব আছে?'

মা চক্ষের জল মুছাইয়া বলিল, 'সবই তো আছে মা—কপালে ঘটিল কই?'

প্র। কেন ঘটে না মা—আমি কী অপরাধ করিয়াছি যে, শ্বশুরের অন্ন থাকিতে আমি খাইতে পাইব না?

মা। এই অভাগীর পেটে হয়েছিলি, এই অপরাধ—আর তোমার কপাল। নহিলে তোমার অন্ন খায় কে?

প্র। শোন মা, আমি আজ মন ঠিক করিয়াছি—শ্বশুরের অন্ন কপালে জোটে, তবে খাইব—নইলে আর খাইব না। তুমি চেয়েচিন্তে যে-প্রকারে পার, আনিয়া খাও। খাইয়া আমাকে সঙ্গে করিয়া শ্বশুরবাড়ি রাখিয়া আইস।

মা। সে কী মা! তাও কী হয়?

প্র। কেন হয় না মা?

মা। না নিতে এলে কি শ্বশুরবাড়ি যেতে আছে?

প্র। পরের বাড়ি চেয়ে খেতে আছে, আর না নিতে এলে আপনার শ্বশুরবাড়ি যেতে নেই?

মা। তারা যে কখনো তোমার নাম করে না।

প্র। না করুক—তাতে আমার অপমান নাই। যাহাদের উপর আমার ভরণপোষণের ভার, তাহাদের কাছে অন্নের ভিক্ষা করিতে আমার অপমান নাই। আপনার ধন আপনি চাহিয়া খাইব—তাহাতে আমার লজ্জা কী?

মা চুপ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। প্রফুল্ল বলিল, 'তোমাকে একা রাখিয়া আমি যাইতে চাহিতাম না—আমার দুঃখ ঘুচিলে তোমারও দুঃখ কমিবে, এই ভরসায় যাইতে চাহিতেছি।'

মাতে মেয়েতে অনেক কথাবার্তা হইল। মা বুঝিল যে, মেয়ের পরামর্শই ঠিক। তখন মা, যে কয়টি চাউল ছিল, তাহা রাঁধিল। কিন্তু প্রফুল্ল কিছুতেই খাইল না। কাজেই তাহার মাতাও খাইল না। তখন বলিল, 'তবে আর বেলা কাটাইয়া কী হইবে? অনেক পথ।'

তাহার মাতা বলিল, 'আয় তোর চুলটা বাঁধিয়া দিই।'

প্রফুল্ল বলিল, 'না, থাক্।'

মা ভাবিল, 'থাক্। আমার মেয়েকে সাজাইতে হয় না।'

মেয়ে ভাবিল, 'থাক্। সেজেগুজে কি ভুলাইতে যাইব? ছি?'

তখন দুইজনে মলিন-বেশে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ নামে গ্রাম; সেইখানে প্রফুল্লমুখীর শ্বশুরবাড়ি। প্রফুল্লের দশা যেমন হউক, তাহার শ্বশুর হরবল্লভবাবু খুব বড়মানুষ লোক। তাঁহার অনেক জমিদারি আছে, দোতলা বৈঠকখানা, ঠাকুরবাড়ি, নাটমন্দির, দপ্তরখানা, খিড়কিতে বাগান, পুকুর-প্রাচীরে বেড়া। সে স্থান প্রফুল্লমুখীর পিত্রালয় হইতে ছয় ক্রোশ। ছয় ক্রোশ পথ হাঁটিয়া মাতা ও কন্যা অনশনে বেলা তৃতীয় প্রহরের সময়ে সে ধনীর গৃহে প্রবেশ করিলেন।

প্রবেশকালে প্রফুল্লের মার পা উঠে না। প্রফুল্ল কাঙ্গালের মেয়ে বলিয়া যে হরবল্লভবাবু তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন, তাহা নহে। বিবাহের পরে একটা গোল হইয়াছিল। হরবল্লভ কাঙ্গাল দেখিয়াও ছেলের বিবাহ দিয়াছিলেন। মেয়েটি পরমসুন্দরী, তেমন মেয়ে আর কোথাও পাইলেন না, তাই সেখানে বিবাহ দিয়াছিলেন। এদিকে প্রফুল্লের মা, কন্যা বড়মানুষের ঘরে পড়িল, এই উৎসাহে সর্বস্ব ব্যয় করিয়া বিবাহ দিয়াছিলেন। সেই বিবাহতেই—তাঁর যাহা কিছু ছিল, ভস্ম হইয়া গেল। সেই অবধি এই অন্নের কাঙ্গাল। কিন্তু অদৃষ্টক্রমে সে সাধের বিবাহে বিপরীত ফল ফলিল। সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও—সর্বস্বই তার কত টাকা?—সর্বস্ব ব্যয় করিয়াও সে বিধবা স্ত্রীলোক সকল দিক্ কুলান করিতে পারিল না।

বরযাত্রীদিগের লুচি-মণ্ডায়, দেশ-কাল-পাত্র বিবেচনায়, উত্তম ফলাহার করাইল। কিন্তু কন্যাযাত্রগণের কেবল চিঁড়া দই। ইহাতে প্রতিবাসী কন্যাযাত্রেরা অপমান বোধ করিলেন। তাঁহারা খাইলেন না—উঠিয়া গেলেন। ইহাতে প্রফুল্লের মা'র সঙ্গে তাঁহাদের কোন্দল বাধিল ; প্রফুল্লের মা বড় গালি দিল। প্রতিবাসীরা একটা বড় রকম শোধ লইল।

পাকস্পর্শের দিন হরবল্লভ বেহাইনের প্রতিবাসী সকলকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাহারা কেহ গেল না—একজন লোক দিয়া বলিয়া পাঠাইল যে—যে কুলটা, জাতিভ্রষ্টা, তাহার সঙ্গে হরবল্লভবাবুর কুটুম্বিতা করিতে হয় করুন—বড়মানুষের সব শোভা পায়, কিন্তু আমরা কাঙ্গাল গরিব, জাতই আমাদের সম্বল-আমরা জাতিভ্রষ্টার কন্যার পাকস্পর্শে জলগ্রহণ করিব না। সমবেত সভামধ্যে এই কথা প্রচার হইল। প্রফুল্লের মা একা বিধবা, মেয়েটি লইয়া ঘরে থাকে—তখন বয়সও যায় নাই—কথা অসম্ভব বোধ হইল না, বিশেষ, হরবল্লভের মনে হইল যে, বিবাহের রাত্রে প্রতিবাসীরা বিবাহবাড়িতে খায় নাই। প্রতিবাসীরা মিথ্যা বলিবে কেন? হরবল্লভ বিশ্বাস করিলেন। সভার সকলেই বিশ্বাস করিল। নিমন্ত্রিত সকলেই ভোজন করিল বটে—কিন্তু কেহই নববধূর স্পৃষ্ট ভোজ্য খাইল না। পরদিন হরবল্লভ বধূকে মাত্রালয়ে পাঠাইয়া দিলেন। সেই অবধি প্রফুল্ল ও তাহার মাতা তাঁহার পরিত্যাজ্য হইল। সেই অবধি আর কখনো তাহাদের সংবাদ লইলেন না ; পুত্রকে লইতেও দিলেন না। পুত্রের অন্য বিবাহ দিলেন। প্রফুল্লের মা দুই-এক বার কিছু সামগ্রী পাঠাইয়া দিয়াছিল, হরবল্লভ তাহা ফিরাইয়া দিয়াছিলেন। তাই আজ সে-বাড়িতে প্রবেশ করিতে প্রফুল্লের মা'র পা কাঁপিতেছিল।

কিন্তু যখন আসা হইয়াছে, তখন আর ফেরা যায় না। কন্যা ও মাতা সাহসে ভর করিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। তখন কর্তা অন্তঃপুরমধ্যে অপরাহ্নিক নিদ্রাসুখে অভিভূত। গৃহিণী—অর্থাৎ প্রফুল্লের শাশুড়ি, পা ছড়াইয়া পাকা চুল তুলাইতেছিলেন। এমন সময়ে সেখানে প্রফুল্ল ও তাহার মা উপস্থিত হইল। প্রফুল্ল মুখে আধহাত ঘোমটা টানিয়া দিয়াছিল। তাহার বয়স এখন আঠারো বৎসর।

গিন্নি ইহাদিগকে দেখিয়া বলিলেন, 'তোমরা কে গা?'

প্রফুল্লের মা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'কী বলিয়াই বা পরিচয় দিব?'

গিন্নি। কেন—পরিচয় আবার কী বলিয়া দেয়?

প্রফুল্লের মা। আমরা কুটুম্ব।

গিন্নি। কুটুম্ব? কে কুটুম্ব গা?

সেখানে তারার মা বলিয়া একজন চাকরানি কাজ করিতেছিল। সে দুই-এক বার প্রফুল্লদিগের বাড়ি গিয়াছিল—প্রথম বিবাহের পরে। সে বলিল, 'ওগো, চিনেছি গো! ওগো চিনেছি! কে! বেহান?'

(সেকালে পরিচারিকারা গৃহিণীর সম্বন্ধ ধরিত।)

গিন্নি। বেহান? কোন্ বেহান?

তারার মা। দুর্গাপুরের বেহান গো—তোমার বড়ছেলের বড়শাশুড়ি।

গিন্নি বুঝিলেন। মুখটা অপ্রসন্ন হইল। বলিলেন, 'বসো।'

বেহান বসিল—প্রফুল্ল দাঁড়াইয়া রহিল। গিন্নি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ মেয়েটি কে গা?'

প্রফুল্লের মা বলিল, 'তোমার বড়বউ।'

গিন্নি বিমর্ষ হইয়া কিছুকাল চুপ করিয়া রহিলেন। পরে বলিলেন, 'তোমরা কোথায় এসেছিলে?'

প্রফুল্লের মা। তোমার বাড়িতেই এসেছি।

গিন্নি। কেন গা?

প্র.মা। কেন, আমার মেয়েকে কি শ্বশুরবাড়িতে আসিতে নাই?

গিন্নি। আসিতে থাকিবে না কেন? শ্বশুর-শাশুড়ি যখন আনিবে, তখন আসিবে। ভালোমানুষের মেয়েছেলে কি গায়ে পড়ে আসে?

প্র.মা। শ্বশুর-শাশুড়ি যদি সাতজন্মে নাম না করে?

গিন্নি। নামই যদি না করে—তবে আসা কেন?

প্র.মা। খাওয়ায় কে? আমি বিধবা অনাথিনী, তোমার বেটার বউকে আমি খাওয়াই কোথা থেকে?
গিন্নি। যদি খাওয়াইতেই পারিবে না, তবে পেটে ধরেছিলে কেন?
প্র.মা। তুমি কি খাওয়া-পরা হিসাব করিয়া বেটা পেটে ধরেছিলে? তাহলে সেইসঙ্গে বেটার বউয়ের খোরাক পোশাকটা ধরিয়া নিতে পার নাই?
গিন্নি। আ মলো! মাগী বাড়ি বয়ে কোঁদল করতে এসেছে যে?
প্র.মা। না, কোঁদল করিতে আসি নাই। তোমার বউ একা আসতে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।
এই বলিয়া প্রফুল্লের মা বাটীর বাহির হইয়া চলিয়া গেল। অভাগীর তখনো আহার হয় নাই।
মা গেল, কিন্তু প্রফুল্ল গেল না। যেমন ঘোমটা দেওয়া ছিল, তেমনই ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। শাশুড়ি বলিল, 'তোমার মা গেল, তুমিও যাও।'
প্রফুল্ল নড়ে না।
গিন্নি। নড় না যে?
প্রফুল্ল নড়ে না।
গিন্নি। কী জ্বালা! আবার কি তোমার সঙ্গে একটা লোক দিতে হবে নাকি?
এবার প্রফুল্ল মুখের ঘোমটা খুলিল; চাঁদপানা মুখ, চক্ষে দরদর ধারা বহিতেছে। শাশুড়ি মনে মনে ভাবিলেন, 'আহা! এমন চাঁদপানা বউ নিয়ে ঘর করতে পেলেম না?' মন একটু নরম হল।
প্রফুল্ল অতি অস্ফুটস্বরে বলিল, 'আমি যাইব বলিয়া আসি নাই।'
গিন্নি। তা কী করিব মা—আমার কি অসাধ যে, তোমায় নিয়ে ঘর করি? লোকে পাঁচ কথা বলে—একঘরে করবে বলে, কাজেই তোমায় ত্যাগ করতে হয়েছে।
প্রফুল্ল। মা, একঘরে হবার ভয়ে কে কবে সন্তান ত্যাগ করেছে? আমি কি তোমার সন্তান নই?
শাশুড়ির মন আরো নরম হল। বলিলেন, 'কী করব মা, জেতের ভয়!'
প্রফুল্ল পূর্ববৎ অস্ফুটস্বরে বলিল, 'হলেম যেন আমি অজাতি—কত শূদ্র তোমার ঘরে দাসীপনা করিতেছে—আমি তোমার ঘরে দাসীপনা করিতে দোষ কী?'
গিন্নি আর যুঝিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'তা মেয়েটি লক্ষ্মী, রূপেও বটে, কথায়ও বটে। তা যাই দেখি কর্তার কাছে, তিনি কী বলেন। তুমি এখানে বসো মা, বসো।'
প্রফুল্ল তখন চাপিয়া বসিল। সেই সময়ে, একটি কপাটের আড়াল হইতে, একটি চতুর্দশবর্ষীয়া বালিকা—সেও সুন্দরী, মুখে আড়ঘোমটা—সে প্রফুল্লকে হাতছানি দিয়া ডাকিল। প্রফুল্ল ভাবিল, এ আবার কী? উঠিয়া বালিকার কাছে গেল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

যখন গৃহিণী ঠাকুরানি হেলিতে দুলিতে হাতের বাউটির খিল খুঁটিতে খুঁটিতে কর্তামহাশয়ের নিকেতনে সমুপস্থিতা, তখন কর্তামহাশয়ের ঘুম ভাঙিয়াছে; হাতেমুখে জল দেওয়া হইয়াছে—হাতমুখ মোছা হইতেছে। দেখিয়া, কর্তার মনটা কাদা করিয়া ছানিয়া লইবার জন্য গৃহিণী ঠাকুরানি বলিলেন, 'কে ঘুম ভাঙাইল? আমি এত করে বারণ করি, তবু কেউ শোনে না?'
কর্তামহাশয় মনে মনে বলিলেন, 'ঘুম ভাঙাইবার আঁধি তুমি নিজে—আজ বুঝি কী দরকার আছে?' প্রকাশ্যে বলিলেন, 'কেউ ঘুম ভাঙায় নাই। বেশ ঘুমাইয়াছি—কথাটা কী?'
গিন্নি মুখখানা হাসি-ভরাভরা করিয়া বলিলেন, 'আজ একটা কাণ্ড হয়েছে। তাই বলতে এসেছি।'
এইরূপ ভূমিকা করিয়া এবং একটু একটু নথ ও বাউটি নাড়া দিয়া—কেননা, বয়স এখনো পঁয়তাল্লিশ বৎসর মাত্র—গৃহিণী, প্রফুল্ল ও তার মাতার আগমন ও কথোপকথন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত

বলিলেন। বধূর চাঁদপানা মুখ ও মিষ্ট কথাগুলি মনে করিয়া, প্রফুল্লের দিকে অনেক টানিয়া বলিলেন। কিন্তু মন্ত্রতন্ত্র কিছুই খাটিল না। কর্তার মুখ বৈশাখের মেঘের মতো অন্ধকার হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন, 'এতবড় স্পর্ধা! সেই বাগদি বেটি আমার বাড়িতে ঢোকে? এখনই ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।'

গিন্নি বলিলেন, 'ছি! ছি! অমন কথা কি বলতে আছে—হাজার হোক, বেটার বউ—আর বাগদির মেয়ে বা কিরূপে হল? লোকে বললেই কি হয়?'

গিন্নি ঠাকুরুন হার কাত নিয়ে খেলতে বসেছেন—কাজে কাজেই এইরকম বদ রঙ্গ চালাইতে লাগিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। 'বাগদি বেটিকে ঝাঁটা মেরে বিদায় কর।' এই হুকুমই বহাল রহিল।

গিন্নি শেষে রাগ করিয়া বলিলেন, 'ঝাঁটা মারিতে হয়, তুমি মার; আমি আর তোমার ঘরকন্নার কথায় থাকিব না।' এই বলিয়া গিন্নি রাগে গরগর করিয়া বাহিরে আসিলেন। যেখানে প্রফুল্লকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেইখানে আসিয়া দেখিলেন, প্রফুল্ল সেখানে নাই।

প্রফুল্ল কোথায় গিয়াছে, তাহা পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে। একখানা কপাটের আড়াল হইতে ঘোমটা দিয়ে একটি চৌদ্দ বছরের মেয়ে তাকে হাতছানি দিয়া ডাকিয়াছিল। প্রফুল্ল সেখানে গেল। প্রফুল্ল সেই ঘরের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র বালিকা দ্বার রুদ্ধ করিল।

প্রফুল্ল বলিল, 'দ্বার দিলে কেন?'

মেয়েটি বলিল, 'কেউ না আসে। তোমার সঙ্গে দুটো কথা কব, তাই।'

প্রফুল্ল বলিল, 'তোমার নাম কী ভাই?'

সে বলিল, 'আমার নাম সাগর, ভাই।'

প্র। তুমি কে, ভাই?

সা। আমি, ভাই, তোমার সতিন।

প্র। তুমি আমায় চেনো নাকি?

সা। এই যে আমি কপাটের আড়াল থেকে সব শুনিলাম।

প্র। তবে তুমিই ঘরণী গৃহিণী—

সা। দূর, তা কেন? পোড়া কপাল আর কী—আমি কেন সে হতে গেলেম? আমার কি তেমনই দাঁত উঁচু, না আমি তত কালো?

প্র। সে কী—কার দাঁত উঁচু?

সা। কেন? যে ঘরণী গৃহিণী?

প্র। সে আবার কে?

সা। জানো না? তুমি কেমন করেই বা জানবে? কখনো তো এসো নি, আমাদের আর-এক সতিন আছে জানো না?

প্র। আমি তো আমি ছাড়া আর-এক বিয়ের কথাই জানি—আমি মনে করিয়াছিলাম, সেই তুমি।

সা। না। সে সেই—আমার তো তিন বছর হল বিয়ে হয়েছে।

প্র। সে বুঝি বড় কুৎসিত?

সা। রূপ দেখে আমার কান্না পায়!

প্র। তাই বুঝি আবার তোমায় বিবাহ করেছে?

সা। না, তা নয়। তোমাকে বলি, কারো সাক্ষাতে বোলো না। (সাগর বড় চুপিচুপি কথা কহিতে লাগিল) আমার বাপের ঢের টাকা আছে। আমি বাপের এক সন্তান। তাই সেই টাকার জন্য—

প্র। বুঝেছি, আর বলতে হবে না। তা তুমি সুন্দরী। যে কুৎসিত, সে ঘরণী গৃহিণী হল কিসে?

সা। আমি বাপের একটি সন্তান, আমাকে পাঠায় না; আর আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের সঙ্গে বড় বনে না। তাই আমি এখানে কখনো থাকি না। কাজেকর্মে কখনো আনে। এই দুই-চারি দিন এসেছি, আবার শীঘ্র যাব।

প্রফুল্ল দেখিল যে, সাগর দিব্য মেয়ে—সতিন বলিয়া ইহার উপর রাগ হয় না। প্রফুল্ল বলিল,

'আমায় ডাকলে কেন?'

সা। তুমি কিছু খাবে?

প্রফুল্ল হাসিল, বলিল, 'কেন এখন খাব কেন?'

সা। তোমার মুখ শুকনো, তুমি অনেক পথ এসেছ, তোমার তৃষ্ণা পেয়েছে। কেউ তোমায় কিছু খেতে বললেন না। তাই তোমাকে ডেকেছি।

প্রফুল্ল তখনো পর্যন্ত কিছু খায় নাই। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিন্তু উত্তর করিল, 'শাশুড়ি গেছেন শ্বশুরের কাছে মন বুঝতে। আমার অদৃষ্টে কী হয়, তা না-জেনে আমি এখানে কিছু খাব না। ঝাঁটা খেতে হয় তো তাই খাব, আর কিছু খাব না।'

সা। না না, এদের কিছু তোমায় খেয়ে কাজ নাই। আমার বাপের বাড়ির সন্দেশ আছে—বেশ সন্দেশ।

এই বলিয়া সাগর কতকগুলো সন্দেশ আনিয়া প্রফুল্লের মুখে গুঁজিয়া দিতে লাগিল। অগত্যা প্রফুল্ল কিছু খাইল। সাগর শীতল জল দিল, পান করিয়া প্রফুল্ল শরীর স্নিগ্ধ করিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, 'আমি শীতল হইলাম, কিন্তু আমার মা না-খাইয়া মরিয়া যাইবে।'

সা। তোমার মা কোথায় গেলেন?

প্র। কী জানি? বোধহয়, পথে দাঁড়াইয়া আছেন।

সা। এক কাজ করব?

প্র। কী?

সা। ব্রহ্ম ঠানদিদিকে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেব?

প্র। তিনি কে?

সা। ঠাকুরের সম্পর্কে পিসি—এই সংসারে থাকেন।

প্র। তিনি কী করবেন?

সা। তোমার মাকে খাওয়াবেন দাওয়াবেন।

প্র। মা এ-বাড়িতে কিছু খাবেন না।

সা। দূর! তাই কী বলছি? কোনো বামুনবাড়িতে।

প্র। যা হয় কর, মা'র কষ্ট আর সহ্য হয় না।

সাগর চকিতের মতো ব্রহ্মঠাকুরানির কাছে যাইয়া সব বুঝাইয়া বলিল। ব্রহ্মঠাকুরানি বলিল, 'মা, তাই তো! গৃহস্থবাড়ি উপবাসী থাকিবেন! অকল্যাণ হবে যে।' ব্রহ্ম প্রফুল্লের মা'র সন্ধানে বাহির হইল। সাগর ফিরিয়া আসিয়া প্রফুল্লকে সংবাদ দিল। প্রফুল্ল বলিল, 'এখন ভাই, যে-গল্প করিতেছিলে, সেই গল্প কর।'

সা। গল্প আর কী? আমি তো এখানে থাকি না—থাকতে পাবও না। আমার অদৃষ্ট মাটির আঁবের মতো—তাকে তোলা থাকব, দেবতার ভোগে কখনো লাগব না। তা, তুমি এয়েচ, যেমন করে পার, থাকো। আমরা কেউ সেই কালপেঁচাটাকে দেখিতে পারি না।

প্র। থাকব বলেই তো এসেছি। থাকতে পেলে তো হয়।

সা। তা দেখ, শ্বশুরের যদি মত না হয়, তবে এখনই চলে যেও না।

প্র। না গিয়া কী করিব? আর কীজন্য থাকিব?—থাকি, যদি—

সা। যদি কী?

প্র। যদি তুমি আমার জন্ম সার্থক করাইতে পার।

সা। সে কিসে হবে ভাই?

প্রফুল্ল ঈষৎ হাসিল। তখনই হাসি নিবিয়া গেল, চক্ষে জল পড়িল। বলিল, 'বুঝ নাই ভাই?'

সাগর তখন বুঝিল। একটু ভাবিয়া, একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, 'তুমি সন্ধ্যার পর এই ঘরে আসিয়া বসিয়া থাকিও। দিনের বেলা তো আর দেখা হবে না।'

পাঠক স্মরণ রাখিবেন, আমরা এখনকার লজ্জাহীনা নব্যাদিগের কথা লিখিতেছি না। আমাদের গল্পের তারিখ একশত বৎসর পূর্বে। চল্লিশ বৎসর পূর্বেও যুবতীরা কখনো দিনমানে স্বামীদর্শন পাইতেন না।

প্রফুল্ল বলিল, 'কপালে কী হয়, তাহা আগে জানিয়া আসি। তারপর তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব। কপালে যাই থাকে, একবার স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া যাইব। তিনি কী বলেন, শুনিয়া যাইব।'

এই বলিয়া প্রফুল্ল বাহিরে আসিল। দেখিল, তাহার শাশুড়ি তাহার তল্লাশ করিতেছেন। প্রফুল্লকে দেখিয়া গিন্নি বলিলেন, 'কোথা ছিলে মা?'

প্র। বাড়িঘর দেখিতেছিলাম।

গিন্নি। আহা! তোমারই বাড়িঘর, বাছা—তা কী করব? তোমার শ্বশুর কিছুতেই মত করেন না।

প্রফুল্লের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। সে মাথায় হাত দিয়া বসিয়া পড়িল। কাঁদিল না—চুপ করিয়া রহিল। শাশুড়ির বড় দয়া হইল। গিন্নি মনে মনে কল্পনা করিলেন—আর একবার নথনাড়া দিয়া দেখিব। কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করিলেন না—কেবল বলিলেন, 'আজ আর কোথায় যাইবে? আজ এইখানে থাকো। কাল সকালে যেও।'

প্রফুল্ল মাথা তুলিয়া বলিল, 'তা থাকিব—একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে একজন মানুষের একবেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কী করিয়া খাইব? আমি বাগদিই হই—মুচিই হই—তাঁহার পুত্রবধূ। তাঁহার পুত্রবধূ কী করিয়া দিনপাত করিবে?'

শাশুড়ি বলিল, 'অবশ্য বলিব।' তারপর প্রফুল্ল উঠিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

সন্ধ্যার পর সেই ঘরে সাগর ও প্রফুল্ল, দুইজনে দ্বার বন্ধ করিয়া চুপিচুপি কথাবার্তা কহিতেছিল, এমন সময়ে কে আসিয়া কপাটে ঘা দিল। সাগর জিজ্ঞাসা করিল, 'কে গো?'

'আমি গো।'

সাগর প্রফুল্লের গা টিপিয়া চুপিচুপি বলিল, 'কথা কস্‌নে; সেই কালপেঁচাটা এসেছে।'

প্র। সতিন?

সা। হ্যাঁ—চুপ!

যে আসিয়াছিল, সে বলিল, 'কে গা ঘরে, কথা কস্‌নে কেন? যেন সাগর বোয়ের গলা শুনলাম না?'

সা। তুমি কে গা—যেন নাপিত বোয়ের গলা শুনিলাম না?

'আহ্‌ মরণ আর কী! আমি কি নাপিত বোয়ের মতন?'

সা। কে তবে তুমি?

'তোর সতিন! সতিন! সতিন! নাম নয়ান বৌ।'

(বউটির নাম—নয়নতারা—লোকে তাহাকে 'নয়ান বৌ' বলিত—সাগরকে 'সাগর বৌ' বলিত।)

সাগর তখন কৃত্রিম ব্যস্ততার সহিত বলিল, 'কে! দিদি! বালাই, তুমি কেন নাপিত বৌয়ের মতন হতে যাবে? সে যে একটু ফরসা।'

নয়ন। মরণ আর কী—আমি কি তার চেয়েও কালো? তা সতিন এমনই বটে—তবু যদি চৌদ্দ বছরের না হতিস্‌।

সা। তা চৌদ্দ বছর হল তো কী হল—তুমি সতেরো—তোমার চেয়ে আমার রূপও আছে, যৌবনও আছে।

ন। রূপ-যৌবন নিয়ে বাপের বাড়িতে বসে বসে ধুয়ে খাস। আমার যেমন মরণ নাই, তাই তোর কাছে কথা জিজ্ঞাসা করতে এলেম।

সা। কী কথা, দিদি?

ন। তুই দোরই খুললি নে, তার কথা কব কী? সন্ধে রাত্রে দোর দিয়েছিস কেন লা?

সা। আমি ভাই লুকিয়ে দুটো সন্দেশ খাচ্ছি। তুমি কি খাও না?

ন। তা খা খা। (নয়ন নিজে সন্দেশ বড় ভালোবাসিত) বলি, জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কী, আবার একজন এয়েছে নাকি?

সা। আবার একজন কী? স্বামী?

ন। মরণ আর কী! তাও কী হয়?

সা। হলে ভালো হত—দুইজনে ভাগ করিয়া নিতাম। তোমার ভাগে নূতনটা দিতাম।

ন। ছি! ছি! ওসব কথা কি মুখে আনে?

সা। মানে?

ন। তুই আমায় যা ইচ্ছা তাই বলিবি কেন?

সা। তা ভাই, কী জিজ্ঞাসা করবে, না-বুঝাইয়া বলিলে কেমন করিয়া উত্তর দিই?

ন। বলি, গিন্নির না কি আর-একটি বউ এয়েছে?

সা। কে বউ?

ন। সেই মুচিবউ।

সা। মুচি? কই, শুনি নে ত।

ন। মুচি? নাহয় বাগদি?

সা। তাও শুনি নে।

ন। শোন নি—আমাদের একজন বাগদি সতিন আছে।

সা। কই? না।

ন। তুই বড় দুষ্ট। সেই যে, প্রথম যে বিয়ে।

সা। সে তো বামনের মেয়ে।

ন। হ্যাঁ, বামনের মেয়ে! তাহলে আর নিয়ে ঘর করে না?

সা। কাল যদি তোমায় বিদায় দিয়ে আমায় নিয়ে ঘর করে, তুমি কি বাগদির মেয়ে হবে?

ন। তুই আমায় গাল দিবি কেন লা, পোড়ারমুখী?

সা। তুই আর-একজনকে গাল দিচ্ছিস কেন্ লা, পোড়ারমুখী?

ন। মর্‌গে যা—আমি ঠাকুরুনকে গিয়া বলিয়া দিই, তুই বড়মানুষের মেয়ে বলে আমায় যা ইচ্ছে তাই বলিস্।

এই বলিয়া নয়নতারা ওরফে কালপেঁচা ঝমর ঝমর করিয়া ফিরিয়া যায়—তখন সাগর দেখিল প্রমাদ! ডাকিল, 'না দিদি, ফেরো ফেরো। ঘাট হয়েছে, দিদি, ফেরো! এই দোর খুলিতেছি।'

নয়নতারা রাগিয়াছিল—ফিরিবার বড় মত ছিল না। কিন্তু ঘরের ভিতর দ্বার দিয়া সাগর কত সন্দেশ খাইতেছে, ইহা দেখিবার একটু ইচ্ছা ছিল, তাই ফিরিল। ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া দেখিল—সন্দেশ নহে—আর-একজন লোক আছে। জিজ্ঞাসা করিল, 'এ আবার কে?'

সা। প্রফুল্ল।

ন। সে আবার কে?

সা। মুচিবউ।

ন। এই সুন্দর?

সা। তোমার চেয়ে নয়।

ন। নে, আর জ্বালাস নে। তোর চেয়ে তো নয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এদিকে কর্তামহাশয় এক প্রহর রাত্রে গৃহমধ্যে ভোজনার্থ আসিলেন। গৃহিণী ব্যজনহস্তে ভোজন-পাত্রের নিকট শোভমানা—ভাতে মাছি নাই—তবু নারীধর্মের পালনার্থ মাছি তাড়াইতে হইবে। হায়! কোন্ পাপিষ্ঠ নরাধমেরা এ পরম রমণীয় ধর্ম লোপ করিতেছে? গৃহিণীর পাঁচজন দাসী আছে—কিন্তু স্বামীসেবা—আর কার সাধ্য করিতে আসে! যে পাপিষ্ঠেরা এ ধর্মের লোপ করিতেছে, হে আকাশ! তাহাদের মাথার জন্য কি তোমার বজ্র নাই?

কর্তা আহার করিতে করিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বাগদি বেটি গিয়াছে কি?'

গৃহিণী মাছি তাড়াইয়া নথ নাড়িয়া বলিলেন, 'রাত্রে আবার সে কোথা যাবে? রাত্রে একটা অতিথি এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বৌটাকে তাড়িয়ে দেব?'

কর্তা। অতিথ হয়, অতিথশালায় যাক না? এখানে কেন?

গিন্নি। আমি তাড়াতে পারব না, আমি তো বলেছি। তাড়াতে হয়, তুমি তাড়াও। বড় সুন্দর বৌ কিন্তু—

কর্তা। বাগদির ঘরে অমন দুটো-একটা সুন্দর হয়। তা আমি তাড়াচ্ছি। ব্রজকে ডাক্ তো রে।

ব্রজ, কর্তার ছেলের নাম। একজন চাকরানি ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ-বাইশ; অনিন্দ্যসুন্দর পুরুষ—পিতার কাছে বিনীতভাবে আসিয়া দাঁড়াইল—কথা কহিতে সাহস নাই।

দেখিয়া হরবল্লভ বলিলেন, 'বাপু, তোমার তিন সংসার মনে আছে?'

ব্রজ চুপ করিয়া রহিল।

'প্রথম বিবাহ মনে হয়—সে একটা বাগদির মেয়ে?'

ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সেকালে কথা কহিত না। এখন যতবড় মূর্খ ছেলে, ততবড় লম্বা স্পিচ্ ঝাড়ে।

কর্তা বলিতে লাগিলেন, 'সে বাগদি বেটি—আজ এখানে এসেছে—জোর করে থাক্‌বে, তা তোমার গর্ভধারিণীকে বললেম যে, ঝাঁটা মেরে তাড়াও। মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে? এ তোমার কাজ। তোমারই অধিকার—আর কেহ স্পর্শ করিতে পারে না। তুমি আজ রাত্রে তাকে ঝাঁটা মেরে তাড়াইয়া দিবে। নহিলে আমার ঘুম হইবে না।'

গিন্নি বলিলেন, 'ছি! বাবা, মেয়েমানুষের গায়ে হাত তুলো না। ওঁর কথা রাখিতেই হইবে, আমার কথা কিছু চলবে না? তা যা কর, ভালো কথায় বিদায় করিও।'

ব্রজ বাপের কথায় উত্তর দিল, 'যে আজ্ঞা!' মার কথায় উত্তর দিল, 'ভালো'।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর একটু দাঁড়াইল। সেই অবকাশে গৃহিণী কর্তাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি যে বৌকে তাড়াবে—বৌ খাবে কী করিয়া?'

কর্তা বলিলেন, 'যা খুশি করুক—চুরি করুক, ডাকাতি করুক—ভিক্ষা করুক।'

গৃহিণী ব্রজেশ্বরকে বলিয়া দিলেন, 'তাড়াইবার সময়ে বৌমাকে এই কথা বলিও। সে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল।'

ব্রজেশ্বর পিতার নিকট হইতে বিদায় হইয়া ব্রহ্মঠাকুরানির নিকুঞ্জে গিয়া দর্শন দিলেন। দেখিলেন, ব্রহ্মঠাকুরানি তদ্‌গতচিত্তে মালা জপ করিতেছেন, আর মশা তাড়াইতেছেন। ব্রজেশ্বর বলিলেন, 'ঠাকুরমা?'

ব্রহ্ম। কেন, ভাই?

ব্রজ। আজ নাকি নূতন খবর?

ব্রহ্ম। কী নূতন? সাগর আমার চরকাটা ভেঙে দিয়েছে তাই? তা ছেলেমানুষ, দিয়েছে দিয়েছে। চরকা কাটতে তার সাধ গিয়েছিল—

ব্রজ। তা নয় তা নয়—বলি আজ নাকি—

ব্রহ্ম। সাগরকে কিছু বলিও না। তোমরা বেঁচে থাকো, আমার কত চরকা হবে। তবে বুড়োমানুষ—

ব্রজ। বলি আমার কথাটা শুনবে?

ব্রহ্ম। বুড়োমানুষ, কবে আছি কবে নেই, দুটো পৈতে তুলে বামুনকে দিই বই তো নয়। তা যাক্ গে—

ব্রজ। আমার কথাটা শোন, নইলে তোমার যত চরকা হবে, সব আমিই ভেঙে দেব।

ব্রহ্ম। কী বল্‌ছ? চরকার কথা নয়?

ব্রজ। তা নয়—আমার দুইটি ব্রাহ্মণী আছে জানো তো?

ব্রহ্ম। ব্রাহ্মণী? মা মা মা! যেমন ব্রাহ্মণী নয়ান বৌ, তেমনি ব্রাহ্মণী সাগর বৌ—আমার হাড়টা খেলে—কেবল রূপকথা বল—রূপকথা বল—রূপকথা বল! ভাই, এত রূপকথা পাব কোথা?

ব্রজ। রূপকথা থাক্—

ব্রহ্ম। তুমি যেন বললে থাক্, তারা ছাড়ে কই? শেষে সেই বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা বলিলাম। বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা জানো? বলি শোন। এক বনে বড় একটা শিমুলগাছে এক বিহঙ্গমা বিহঙ্গমী থাকে—

ব্রজ। সর্বনাশ! ঠাকুরমা, কর কী? এখন রূপকথা! আমার কথা শোন।

ব্রহ্ম। তোমার আবার কথা কী? আমি বলি, রূপকথা শুনিতে এয়েছ—তোমাদের তো আর কাজ নাই?

ব্রজেশ্বর মনে মনে ভাবিল, 'কবে বুড়িদের প্রাপ্তি হবে।' প্রকাশ্যে বলিল, আমার দুইটি ব্রাহ্মণী—আর একটি বাগদিনী। বাগদিনীটি নাকি আজ এয়েছে?'

ব্রহ্ম। বালাই বালাই—বাগদিনী কেন? সে বামনের মেয়ে।

ব্রজ। এয়েছে?

ব্রহ্ম। হাঁ।

ব্রজ। কোথায়? একবার দেখা হয় না?

ব্রহ্ম। হাঁ! আমি দেখা করিয়ে দিয়ে তোমার বাপ-মা'র দু চক্ষের বিষ হই! তার চেয়ে বিহঙ্গমা বিহঙ্গমীর কথা শোন।

ব্রজ। ভয় নাই—বাপ-মা আমাকে ডাকাইয়া বলিয়াছেন—তাকে তাড়াইয়া দাও। তা দেখা না পেলে, তাড়াইয়া দিব কী প্রকারে? তুমি ঠাকুরমা, তোমার কাছে সন্ধানের জন্য আসিয়াছি।

ব্রহ্ম। ভাই, আমি বুড়োমানুষ—কৃষ্ণনাম জপ করি, আর আলো চাল খাই। রূপকথা শোন তো বলতে পারি। বাগদির কথাতেও নাই, বামনীর কথাতেও নাই।

ব্রজ। হায়! বুড়ো বয়সে কবে তুমি ডাকাতের হাতে পড়িবে!

ব্রহ্ম। অমন কথা বলিস নে—বড় ডাকাতের ভয়! কী, দেখা করবি?

ব্রজ। তা নহিলে কি তোমার মালাজপা দেখ্‌তে এসেছি?

ব্রহ্ম। সাগর বৌয়ের কাছে যা।

ব্রজ। সতিনে কি সতিনকে দেখায়?

ব্রহ্ম। তুই যা না। সাগর তোকে ডেকেছে, ঘরে গিয়ে বসে আছে। অমন মেয়ে আর হয় না।

ব্রজ। চরকা ভেঙেছে বলে? নয়ানকে বলে দেব—সে যেন একটা চরকা ভেঙে দেয়।

ব্রহ্ম। হাঁ—সাগরে, আর নয়ানে! যা যা!

ব্রজ। গেলে বাগদিনী দেখ্‌তে পাব?

ব্রহ্ম। বুড়ির কথাটাই শোন্ না; কী জ্বালাতেই পড়লেম গা? আমার মালা জপ হল না। তোর ঠাকুরদাদার তেষট্টিটা বিয়ে ছিল—কিন্তু চৌদ্দ বছরই হোক আর চুয়াত্তর বছরই হোক—কই কেউ ডাক্‌লে তো কখনো 'না' বলিত না।

ব্রজ। ঠাকুরদাদার অক্ষয় স্বর্গ হোক—আমি চৌদ্দ বছরের সন্ধানে চলিলাম। ফিরিয়া আসিয়া

ছুয়াত্তর বছরের সন্ধান লইব কি?

ব্রহ্ম। যা যা যা! আমার মালা জপ ঘুরে গেল। আমি নয়নতারাকে বলে দিব, তুই বড় চেঙড়া হয়েছিস্।

ব্রজ। বলে দিও। খুশি হয়ে দুটো ছোলাভাজা পাঠিয়ে দেবে।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর সাগরের সন্ধানে প্রস্থান করিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

সাগর শ্বশুরবাড়ি আসিয়া দুইটি ঘর পাইয়াছিল, একটি নিচে, একটি উপরে।

নিচের ঘরে বসিয়া সাগর পান সাজিত, সমবয়স্কদিগের সঙ্গে খেলা করিত, কি গল্প করিত। উপরের ঘরে রাত্রে শুইত ; দিনমানে নিদ্রা আসিলে সেই ঘরে গিয়া দ্বার দিত। অতএব ব্রজেশ্বর, ব্রহ্মঠাকুরানির উপকথার জ্বালা এড়াইয়া সেই উপরের ঘরে গেলেন।

সেখানে সাগর নাই—কিন্তু তাহার পরিবর্তে আর একজন কে আছে। অনুভবে বুঝিলেন, এই সেই প্রথমা স্ত্রী।

বড় গোল বাধিল। দুইজনে সম্বন্ধ বড় নিকট—স্ত্রী-পুরুষ—পরস্পরের অর্ধাঙ্গ, পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। কিন্তু কখনো দেখা নাই। কখনো কথা নাই। কী বলিয়া কথা আরম্ভ হইবে? কে আগে কথা কহিবে? বিশেষ একজন তাড়াইতে আসিয়াছে, আর-একজন তাড়া খাইতে আসিয়াছে। আমরা প্রাচীনা পাঠিকাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, কথাটা কীরকমে আরম্ভ হওয়া উচিত ছিল?

উচিত যাই হউক—উচিতমতো কিছুই হইল না। প্রথমে দুইজনের একজনও অনেকক্ষণ কথা কহিল না। শেষে প্রফুল্ল অল্প, অল্পমাত্র হাসিয়া, গলায় কাপড় দিয়া ব্রজেশ্বরের পায়ের গোড়ায় আসিয়া ঢিপ করিয়া প্রণাম করিল।

ব্রজেশ্বর বাপের মতো নহে। প্রণাম গ্রহণ করিয়া অপ্রতিভ হইয়া বাহু ধরিয়া প্রফুল্লকে উঠাইয়া পালঙ্কে বসাইল। বসাইয়া আপনি কাছে বসিল।

প্রফুল্লের মুখে একটু ঘোমটা ছিল—সেকালের মেয়েরা একালের মেয়েদের মতো নহে—ধিক্ এ কাল! তা সে ঘোমটাটুকু, প্রফুল্লকে ধরিয়া বসাইবার সময়ে সরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিল যে, প্রফুল্ল কাঁদিতেছে। ব্রজেশ্বর না-বুঝিয়াসুঝিয়া—আ ছি! ছি! ছি! বাইশ বছর বয়সেই ধিক্! ব্রজেশ্বর না বুঝিয়াসুঝিয়া, না ভাবিয়াচিন্তিয়া, যেখানে বড় ভবভবে চোখের নিচে দিয়া একফোঁটা জল গড়াইয়া আসিতেছিল—সেই স্থানে—আ! ছি! ছি!—ব্রজেশ্বর হঠাৎ চুম্বন করিলেন। গ্রন্থকার প্রাচীন—লিখিতে লজ্জা নাই—কিন্তু ভরসা করি, মার্জিতরুচি নবীন পাঠক এইখানে এ বই পড়া বন্ধ করিবেন।

যখন ব্রজেশ্বর এই ঘোরতর অশ্লীলতা-দোষে নিজে দূষিত হইতেছিলেন, এবং গ্রন্থকারকে সেই দোষে দূষিত করিবার কারণ হইতেছিলেন—যখন নির্বোধ প্রফুল্ল মনে মনে ভাবিতেছিল যে, বুঝি এই মুখচুম্বনের মতো পবিত্র পুণ্যময় কর্ম ইহজগতে কখনো কেহ করে নাই, সেই সময়ে দ্বারে কে মুখ বাড়াইল। মুখখানা বুঝি অল্প একটু হাসিয়াছিল—কি যার মুখ, তার হাতের গহনার বুঝি একটু শব্দ হইয়াছিল—তাই ব্রজেশ্বরের কান সেদিকে গেল। ব্রজেশ্বর সেদিকে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন, মুখখানা বড় সুন্দর। কালো কুচকুচে কোঁকড়া কোঁকড়া ঝাঁপটায় বেড়া—তখন মেয়েরা ঝাঁপটা রাখিত—তার উপর একটু ঘোমটা টানা—ঘোমটার ভিতর দুইটা পদ্ম-পলাশ চক্ষু ও দুইখানা পাতলা রাঙা ঠোঁট মিঠে মিঠে হাসিতেছে। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, মুখখানা সাগরের। সাগর স্বামীকে একটা চাবি ও কুলুপ দেখাইল। সাগর ছেলেমানুষ ; স্বামীর সঙ্গে জিয়াদা কথা কয় না। ব্রজ কিছু বুঝিতে পারিলেন না। কিন্তু বুঝিতে বড় বিলম্বও হইল না। সাগর বাহির হইতে কপাট টানিয়া দিল; শিকল লাগাইয়া, কুলুপের চাবি ফিরাইয়া বন্ধ করিয়া দুড় দুড় করিয়া ছুটিয়া পলাইল। ব্রজেশ্বর, কুলুপ পড়িল শুনিতে

পাইয়া, 'কী কর, সাগর! কী কর, সাগর!' বলিয়া চেঁচাইল। সাগর কিছুতেই কান না দিয়া দুড়দুড় ঝমঝম করিয়া ছুটিয়া একেবারে ব্রহ্মঠাকুরানির বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল।

ব্রহ্মঠাকুরানি বলিলেন, 'কি লা সাগর বৌ? কী হয়েছে? এখানে এসে শুলি যে?'

সাগর কথা কয় না।

ব্রহ্ম। তোকে ব্রজ তাড়িয়ে দিয়েছে না কি?

সা। তা নইলে আর তোমার আশ্রমে আসি? আজ তোমার কাছে শোব।

ব্রহ্ম। তা শো শো। এখনই আবার ডাকবে এখন! আহা! তোর ঠাকুরদাদা এমন বারো মাস ত্রিশ দিন আমায় তাড়িয়ে দিয়েছে। আবার তখনই ডেকেছে—আমি আরো রাগ করে যেতাম না—তা মেয়েমানুষের প্রাণ ভাই! থাকতেও পারিতাম না। একদিন হল কী—

সা। ঠানদিদি, একটা রূপকথা বল না।

ব্র। কোন্‌টা বলব, বিহঙ্গম বিহঙ্গমীর কথা বলব? একলা শুনবি, তা নূতন বৌটা কোথায়? তাকে ডাক না—দুজনে শুনবি।

সা। সে কোথা, আমি এখন খুঁজিতে পারি না। আমি একাই শুনব। তুমি বল।

ব্রহ্মঠাকুরানি তখন সাগরের কাছে শুইয়া বিহঙ্গমের গল্প আরম্ভ করিলেন। সাগর তাহার আরম্ভ হইতে-না-হইতেই ঘুমাইয়া পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরানি সে সংবাদ অনবগত, দুই-চারি দণ্ড গল্প চালাইলেন ; পরে যখন জানিতে পারিলেন শ্রোত্রী নিদ্রামগ্ন, তখন দুঃখিতচিত্তে মাঝখানেই গল্প সমাপ্ত করিলেন।

পরদিন প্রভাত হইতে-না-হইতেই সাগর আসিয়া, ঘরের কুলুপ খুলিয়া দিয়া গেল। তারপর কাহাকে কিছু না বলিয়া ব্রহ্মঠাকুরানির ভাঙা চরকা লইয়া, সেই নিদ্রামগ্না বর্ষীয়সীর কানের কাছে ঘেনর ঘেনর করিতে লাগিল।

'কটাশ—ঝনাৎ' করিয়া কুলুপ শিকল খোলার শব্দ হইল—প্রফুল্ল ও ব্রজেশ্বর তাহা শুনিল। প্রফুল্ল বসিয়াছিল—উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল, 'সাগর শিকল খুলিয়াছে। আমি চললাম। স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।'

ব্র। এখন যাইও না। আমি একবার কর্তাকে বলিয়া দেখিব।

প্র। বলিলে কি তাঁর মন ফিরিবে।

ব্র। না ফিরুক, আমার কাজ আমায় করিতে হইবে। অকারণে তোমায় ত্যাগ করিয়া আমি কি অধর্মে পতিত হইব?

প্র। তুমি আমায় ত্যাগ কর নাই—গ্রহণ করিয়াছ। আমাকে একদিনের জন্য শয্যার পাশে ঠাঁই দিয়াছ—আমার সেই ঢের। তোমার কাছে ভিক্ষা করিতেছি, আমার মতো দুঃখিনীর জন্য বাপের সঙ্গে তুমি বিবাদ করিও না। তাতে আমি সুখী হইব না।

ব্র। নিতান্ত পক্ষে, তিনি যাহাতে তোমার খোরপোশ পাঠাইয়া দেন, তা আমায় করিতে হইবে।

প্র। তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা লইব।

ব্র। আমার কিছুই নাই, কেবল আমার এই আঙ্গটিটি আছে। এখন এইটি লইয়া যাও। আপাতত ইহার মূল্যে কতক দুঃখ নিবারণ হইবে। তারপর যাহাতে আমি দুই পয়সা রোজগার করিতে পারি, সেই চেষ্টা করিব। যেমন করিয়া পারি, আমি তোমার ভরণপোষণ করিব।

এই বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনার অঙ্গুলি হইতে বহুমূল্য হীরকাঙ্গুরীয় উন্মোচন করিয়া প্রফুল্লকে দিল। প্রফুল্ল আপনার আঙুলে আঙ্গটিটি পরাইতে পরাইতে বলিল, 'যদি তুমি আমাকে ভুলিয়া যাও?'

ব্র। সকলকে ভুলিব—তোমায় ভুলিব না।

প্র। যদি এর পর চিনিতে না পার?

ব্র। ও মুখ কখনো ভুলিব না।

প্র। আমি এ আঙ্গটিটি বেচিব না। না-খাইয়া মরিয়া যাইব, তবু কখনো বেচিব না। যখন তুমি

আমাকে না-চিনিতে পারিবে, তখন তোমাকে এই আঙ্গটি দেখাইব। ইহাতে কী লেখা আছে?

ব্র। আমার নাম খোদা আছে।

দুইজনে অশ্রুজলে নিষিক্ত হইয়া পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল।

প্রফুল্ল নিচে আসিলে সাগর ও নয়ানের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। পোড়ারমুখী নয়ান বলিল, 'দিদি, কাল রাত্রে কোথায় শুইয়াছিলি?'

প্র। ভাই, কেহ তীর্থ করিলে সে-কথা আপনার মুখে বলে না।

ন। সে আবার কী?

সাগর। বুঝতে পারিস্ নে? কাল উনি আমাকে তাড়াইয়া আমার পালঙ্কে, বিষ্ণুর লক্ষ্মী হইয়াছিলেন। মিন্‌সে আবার সোহাগ করে আঙ্গটি দিয়েছে।

সাগর নয়ানকে প্রফুল্লের হাতে ব্রজেশ্বরের আঙ্গটি দেখাইল। দেখিয়া নয়নতারা হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া গেল। বলিল, 'দিদি, ঠাকুর তোমার কথার কী উত্তর দিয়াছেন, শুনেছ?'

প্রফুল্লের সে কথা আর মনে ছিল না, সে ব্রজেশ্বরের আদর পাইয়াছিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, 'কী কথার উত্তর?'

না। তুমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, কী করিয়া খাইবে?

প্র। তার আর উত্তর কী?

ন। ঠাকুর বলিয়াছেন, চুরি-ডাকাতি করিয়া খাইতে বলিও।

'দেখা যাবে' বলিয়া প্রফুল্ল বিদায় হইল।

প্রফুল্ল আর কাহারো সঙ্গে কথা কহিল না। একেবারে বাহিরে খিড়কিদ্বার পার হইল। সাগর পিছু পিছু গেল। প্রফুল্ল তাহাকে বলিল, 'আমি, ভাই, আজ চলিলাম। এ বাড়িতে আর আসিব না। তুমি বাপের বাড়ি গেলে, সেখানে তোমার সঙ্গে দেখা হইবে।'

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ি চেনো?

প্র। না চিনি, চিনিয়া যাইব।

সা। তুমি আমার বাপের বাড়ি যাবে?

প্র। আমার আর লজ্জা কী?

সা। তোমার মা তোমার সঙ্গে দেখা করিবেন বলিয়া দাঁড়াইয়া আছেন।

বাগানের দ্বারের কাছে যথার্থ প্রফুল্লের মা দাঁড়াইয়া ছিল। সাগর দেখাইয়া দিল। প্রফুল্ল মা'র কাছে গেল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল ও প্রফুল্লের মা বাড়ি আসিল। প্রফুল্লের মা'র যাতায়াতে বড় শারীরিক কষ্ট গিয়াছে—মানসিক কষ্ট ততোধিক। সকল সময় সব সয় না। ফিরিয়া প্রফুল্লের মা জ্বরে পড়িল। প্রথমে জ্বর অল্প, কিন্তু বাঙালির ঘরের মেয়ে, বামনের ঘরের মেয়ে—তাতে বিধবা, প্রফুল্লের মা জ্বরকে জ্বর বলিয়া মানিল না। তারই উপর দুবেলা স্নান, জুটিলে আহার, পূর্বমতো চলিল। প্রতিবাসীরা দয়া করিয়া কখনো কিছু দিত, তাহাতে আহার চলিত। ক্রমে জ্বর অতিশয় বৃদ্ধি পাইল—শেষে প্রফুল্লের মা শয্যাগত হইল। সেকালে সেই সকল গ্রাম্য প্রদেশে চিকিৎসাপত্র বড় ছিল না—বিধবারা প্রায়ই ঔষধ খাইত না—বিশেষ প্রফুল্লের এমন লোক নাই যে, কবিরাজ ডাকে। কবিরাজও দেশে না-থাকারই মধ্যে। জ্বর বাড়িল—বিকার প্রাপ্ত হইল, শেষে প্রফুল্লের মা সকল দুঃখ হইতে মুক্ত হইলেন।

পাড়ার পাঁচজন, যাহারা তাহার অমূলক কলঙ্ক রটাইয়াছিল, তাহারাই আসিয়া প্রফুল্লের মা'র সৎকার করিল। বাঙালিরা এ-সময় শত্রুতা রাখে না। বাঙালি জাতির সে গুণ আছে।

প্রফুল্ল একা। পাড়ার পাঁচজন আসিয়া বলিল, 'তোমাকে চতুর্থের শ্রাদ্ধ করিতে হইবে।' প্রফুল্ল বলিল, 'ইচ্ছা, পিণ্ডদান করি—কিন্তু কোথায় কী পাইব?' পাড়ার পাঁচজন বলিল, 'তোমায় কিছু করিতে হইবে না—আমরা সব করিয়া লইতেছি।' কেহ কিছু নগদ দিল, কেহ কিছু সামগ্রী দিল, এইরূপ করিয়া শ্রাদ্ধ ও ব্রাহ্মণভোজনের উদ্যোগ হইল। প্রতিবাসীরা আপনারাই সকল উদ্যোগ করিয়া লইল।

একজন প্রতিবাসী বলিল, 'একটা কথা মনে হইতেছে। তোমার মা'র শ্রাদ্ধে তোমার শ্বশুরকে নিমন্ত্রণ করা উচিত কি না?'

প্রফুল্ল বলিল, 'কে নিমন্ত্রণ করিতে যাইবে?'

দুইজন পাড়ার মাতবর লোক অগ্রসর হইল। সকল কাজে তাহারাই আগু হয়—তাদের সেই রোগ। প্রফুল্ল বলিল, 'তোমরাই আমাদের কলঙ্ক রটাইয়া সে ঘর ঘুচাইয়াছ।'

তাহারা বলিল, 'সে কথা আর মনে করিও না। আমরা সে কথা সারিয়া লইব। তুমি এখন অনাথা বালিকা—তোমার সঙ্গে আর আমাদের কোনো বিবাদ নাই।'

প্রফুল্ল সম্মত হইল। দুইজন হরবল্লভকে নিমন্ত্রণ করিতে গেল। হরবল্লভ বলিলেন, 'কি ঠাকুর! তোমরাই বিহাইনকে জাতিভ্রষ্টা বলিয়া তাকে একঘরে করেছিলে—আবার তোমাদেরই মুখে এই কথা?'

ব্রাহ্মণেরা বলিল, 'সে কী জানেন—অমন পাড়াপড়শীতে গোলযোগ হয়—সেটা কোনো কাজের কথা নয়।'

হরবল্লভ বিষয়ী লোক—ভাবিলেন, 'এ সব জুয়াচুরি। এ বেটারা বাগদি বেটির কাছে টাকা খাইয়াছে। ভালো, বাগদি বেটি টাকা পাইল কোথা?' অতএব হরবল্লভ নিমন্ত্রণের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না। তাঁহার মন প্রফুল্লের প্রতি বরং আরো নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর এ সকল শুনিল। মনে করিল, 'একদিন রাত্রে লুকাইয়া গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব। সেই রাত্রেই ফিরিব।'

প্রতিবাসীরা নিষ্ফল হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। প্রফুল্ল যথারীতি মাতৃশ্রাদ্ধ করিয়া প্রতিবাসীদিগের সাহায্যে ব্রাহ্মণভোজন সম্পন্ন করিল। ব্রজেশ্বর যাইবার সময় খুঁজিতে লাগিল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

ফুলমণি নাপিতানীর বাস প্রফুল্লের বাসের নিকট। মাতৃহীন হইয়া অবধি প্রফুল্ল একা গৃহে বাস করে। প্রফুল্ল সুন্দরী, যুবতী, রাত্রে একা বাস করে, তাহাতে ভয়ও আছে, কলঙ্কও আছে। কাছে শুইবার জন্য রাত্রে একজন স্ত্রীলোক চাই। ফুলমণিকে এজন্য প্রফুল্ল অনুরোধ করিয়াছিল। ফুলমণি বিধবা; তার এক বিধবা ভগিনী ভিন্ন কেহ নাই। আর তারা দুই বোনেই প্রফুল্লের মা'র অনুগত ছিল। এইজন্য প্রফুল্ল ফুলমণিকে অনুরোধ করে, আর ফুলমণিও সহজে স্বীকার করে। অতএব যেদিন প্রফুল্লের মা মরিয়াছিল, সেই দিন অবধি প্রফুল্লের বাড়িতে ফুলমণি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর আসিয়া শোয়।

তবে ফুলমণি কী চরিত্রের লোক, তাহা ছেলেমানুষ প্রফুল্ল সবিশেষ জানিত না। ফুলমণি প্রফুল্লের অপেক্ষা বয়সে দশ বছরের বড়। দেখিতে শুনিতে মন্দ নয়, বেশভূষায় একটু পারিপাট্য রাখিত। একে ইতর জাতির মেয়ে, তাতে বালবিধবা; চরিত্রটা বড় খাঁটি রাখিতে পারে নাই। গ্রামের জমিদার পরাণ চৌধুরী। তাঁহার একজন গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তী ঐ গ্রামে আসিয়া মধ্যে মধ্যে কাছারি করিত। লোকে বলিত, ফুলমণি দুর্লভের বিশেষ অনুগৃহীতা—অথবা দুর্লভ তাহার অনুগৃহীত। এ সকল কথা প্রফুল্ল একেবারে যে কখনো শুনে নাই—তা নয়, কিন্তু কী করে—আর কেহ আপনার ঘরদ্বার ফেলিয়া প্রফুল্লের কাছে আসিয়া শুইতে চাহে না। বিশেষ প্রফুল্ল মনে করিল, 'সে মন্দ হোক, আমি না মন্দ হইলে আমায় কে মন্দ করিবে?'

অতএব ফুলমণি দুই-চারি দিন আসিয়া প্রফুল্লের ঘরে শুইল। শ্রাদ্ধের পরদিন ফুলমণি একটু দেরি

করিয়া আসিতেছিল। পথে একটা আমগাছের তলায়, একটা বন আছে, আসিবার সময় ফুলমণি সেই বনে প্রবেশ করিল। সে বনের ভিতর একজন পুরুষ দাঁড়াইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, সে সেই দুর্লভচন্দ্র।

চক্রবর্তী মহাশয় কৃতাভিসারা, তাম্বুলরাগরক্তাধরা, রাঙাপেড়ে শাড়িপরা, হাসিতে মুখভরা ফুলমণিকে দেখিয়া বলিলেন, 'কেমন, আজ?'

ফুলমণি বলিলেন, 'হাঁ, আজই বেশ। তুমি রাত্রি দুপুরের সময় পালকি নিয়ে এসো—দুয়ারে টোকা মেরো। আমি দুয়ার খুলিয়া দিব। কিন্তু দেখো, গোল না হয়।'

দুর্লভ। তার ভয় নাই। কিন্তু সে তো গোল করবে না?

ফুলমণি। তার একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আমি আস্তে আস্তে দোরটি খুলব, তুমি আস্তে আস্তে, সে ঘুমিয়ে থাকতে থাকতে তার মুখটি কাপড় দিয়া চাপিয়া বাঁধিয়া ফেলিবে। তার পর চেঁচায় কার বাপের সাধ্য!

দুর্লভ। তা, অমন জোর করে নিয়ে গেলে কয় দিন থাকিবে?

ফুল। একবার নিয়ে যেতে পারলেই হল। যার তিন কুলে কেউ নেই, যে অন্নের কাঙাল; সে খেতে পাবে, কাপড় পাবে, গয়না পাবে, টাকা পাবে, সোহাগ পাবে—সে আবার থাকবে না? সে ভার আমার–আমি যেন গয়না টাকার ভাগ পাই।

এইরূপ কথাবার্তা সমাপ্ত হইলে, দুর্লভ স্বস্থানে গেল—ফুলমণি প্রফুল্লের কাছে গেল। প্রফুল্ল এ সর্বনাশের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। সে মা'র কথা ভাবিতে ভাবিতে শয়ন করিল। মা'র জন্য যেমন কাঁদে, তেমনি কাঁদিল; কাঁদিয়া যেমন রোজ ঘুমায়, তেমনি ঘুমাইল। দুই প্রহরে দুর্লভ আসিয়া দ্বারে টোকা মারিল। ফুলমণি দ্বার খুলিল। দুর্লভ প্রফুল্লের মুখ বাঁধিয়া ধরাধরি করিয়া পালকিতে তুলিল। বাহকেরা নিঃশব্দে তাহাকে পরাণবাবু জমিদারের বিহার-মন্দিরে লইয়া চলিল। বলা বাহুল্য, ফুলমণি সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ইহার অর্ধ দণ্ড পরে ব্রজেশ্বর সেই শূন্যগৃহে প্রফুল্লের সন্ধানে আসিয়া উপস্থিত হইল। ব্রজেশ্বর সকলকে লুকাইয়া রাত্রে পলাইয়া আসিয়াছে। হায়! কোথাও কেহ নাই।

প্রফুল্লকে লইয়া বাহকেরা নিঃশব্দে চলিল বলিয়াছি; কেহ মনে না করেন—এটা ভ্রম-প্রমাদ! বাহকের প্রকৃতি শব্দ করা। কিন্তু এবার শব্দ করার পক্ষে তাহাদের প্রতি নিষেধ ছিল। শব্দ করিলে গোলযোগ হইবে; তা ছাড়া আর একটা কথা ছিল। ব্রহ্মঠাকুরানির মুখে শুনা গিয়াছে, বড় ডাকাতের ভয়। বাস্তবিক এরূপ ভয়ানক দস্যুভীতি কখনো কোনো দেশে হইয়াছিল কি না সন্দেহ। তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভালো করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে। তার পর আবার দেবী সিংহের ইজারা। পৃথিবীর ওপারে ওয়েস্ট মিনস্টর হলে দাঁড়াইয়া এদমন্দ বর্ক সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্বতোদ্গীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বর্ক, দেবী সিংহকে দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্তকালসমীপে পাঠাইয়াছেন। তাঁহার নিজমুখে সে দৈববাণীতুল্য বাক্যপরম্পরা শুনিয়া শোকে অনেক স্ত্রীলোক মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছিল—আজিও শত বৎসর পরে সেই বক্তৃতা পড়িতে গেলে শরীর রোমাঞ্চিত এবং হৃদয় উন্মত্ত হয়। সেই ভয়ানক অত্যাচার বরেন্দ্রভূমি ডুবাইয়া দিয়াছিল। অনেকেই কেবল খাইতে পায় না নয়, গৃহে পর্যন্ত বাস করিতে পায় না। যাহাদের খাইবার নাই, তাহারা পরের কাড়িয়া খায়। কাজেই এখন গ্রামে গ্রামে দলে দলে চোর-ডাকাত। কাহার সাধ্য শাসন করে? গুডল্যাড্ সাহেব রঙ্গপুরের প্রথম কালেক্টর। ফৌজদারি তাঁহারই জিম্মা। তিনি দলে দলে সিপাহি ডাকাত ধরিতে পাঠাইতে লাগিলেন। সিপাহিরা কিছুই করিতে পারিল না।

অতএব দুর্লভের ভয়, তিনি ডাকাতি করিয়া প্রফুল্লকে লইয়া যাইতেছেন, আবার তার উপর ডাকাতে না ডাকাতি করে। পালকি দেখিয়া ডাকাতের আসা সম্ভব। সেই ভয়ে, বেহারারা নিঃশব্দ। গোলমাল হইবে বলিয়া সঙ্গে আর অপর লোকজনও নাই, কেবল দুর্লভ নিজে আর ফুলমণি। এইরূপে তাহারা ভয়ে ভয়ে চারি ক্রোশ ছাড়াইল।

তার পর ভারি জঙ্গল আরম্ভ হইল। বেহারারা সভয়ে দেখিল, দুইজন মানুষ সম্মুখে আসিতেছে। রাত্রিকাল—কেবল নক্ষত্রালোকে পথ দেখা যাইতেছে। সুতরাং তাহাদের অবয়ব অস্পষ্ট দেখা যাইতেছিল। বেহারারা দেখিল, যেন কালান্তক যমের মতো দুই মূর্তি আসিতেছে। একজন বেহারা অপরদিগকে বলিল, 'মানুষ দুটোকে সন্দেহ হয়!' অপর আর একজন বলিল, 'রাত্রে যখন বেড়াচ্চে, তখন কি আর ভালো মানুষ?'

তৃতীয় বাহক বলিল, 'মানুষ দুটো ভারি জোয়ান।'

৪র্থ। হাতে লাঠি দেখ্ছি না।

১ম। চক্রবর্তী মশাই কী বলেন? আর তো এগোনো যায় না—ডাকাতের হাতে প্রাণটা যাবে।

চক্রবর্তী মহাশয় বলিলেন, 'তাই তো, বড় বিপদ দেখি যে! যা ভেবেছিলাম, তাই হল?'

এমন সময়ে, যে দুই ব্যক্তি আসিতেছিল, তাহারা পথে লোক দেখিয়া হাঁকিল, 'কোন্ হ্যায় রে?'

বেহারারা অমনি পালকি মাটিতে ফেলিয়া দিয়া 'বাবা গো' শব্দ করিয়া একেবারে জঙ্গলের ভিতর পলাইল। দেখিয়া দুর্লভ চক্রবর্তী মহাশয়ও সেই পথাবলম্বী হইলেন। তখন ফুলমণি 'আমায় ফেলে কোথা যাও?' বলিয়া তাঁর পাছু পাছু ছুটিল।

যে দুইজন আসিতেছিল—যাহারা এই দশজন মনুষ্যের ভয়ের কারণ—তাহারা পথিক মাত্র। দুইজন হিন্দুস্থানি দিনাজপুরের রাজসরকারের চাকরির চেষ্টায় যাইতেছে। রাত্রিপ্রভাত নিকট দেখিয়া সকালে সকালে পথ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। বেহারারা পলাইল দেখিয়া তাহারা একবার খুব হাসিল। তাহার পর আপনাদের গন্তব্যপথে চলিয়া গেল। কিন্তু বেহারারা, আর ফুলমণি ও চক্রবর্তী মহাশয় আর পাছু ফিরিয়া চাহিল না।

প্রফুল্ল পালকিতে উঠিয়াই মুখের বাঁধন স্বহস্তে খুলিয়া ফেলিয়াছিল। রাত্রি দুই প্রহরে চিৎকার করিয়া কী হইবে বলিয়া চিৎকার করে নাই; চিৎকার শুনিতে পাইলেই বা কে ডাকাতের সম্মুখে আসিবে। প্রথমে ভয়ে প্রফুল্ল কিছু আত্মবিস্মৃত হইয়াছিল, কিন্তু এখন প্রফুল্ল স্পষ্ট বুঝিল যে, সাহস না করিলে মুক্তির কোনো উপায় নাই। যখন বেহারারা পালকি ফেলিয়া পলাইল, তখন প্রফুল্ল বুঝিল—আর একটা কী নূতন বিপদ্। ধীরে ধীরে পালকির কপাট খুলিল। অল্প মুখ বাড়াইয়া দেখিল, দুইজন মনুষ্য আসিতেছে। তখন প্রফুল্ল ধীরে ধীরে কপাট বন্ধ করিল; যে অল্প ফাঁক রহিল, তাহা দিয়া প্রফুল্ল দেখিল, মনুষ্য দুইজন চলিয়া গেল। তখন প্রফুল্ল পালকি হইতে বাহির হইল—দেখিল, কেহ কোথাও নাই।

প্রফুল্ল ভাবিল, যাহারা আমাকে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, তাহারা অবশ্য ফিরিবে। অতএব যদি পথ ধরিয়া যাই, তবে ধরা পড়িতে পারি। তার চেয়ে এখন জঙ্গলের ভিতর লুকাইয়া থাকি। তার পর, দিন হইলে যা হয় করিব।

এই ভাবিয়া প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল। ভাগ্যক্রমে যেদিকে বেহারারা পলাইয়াছিল, সে দিকে যায় নাই। সুতরাং কাহারো সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল না। প্রফুল্ল জঙ্গলের ভিতর স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অল্পক্ষণ পরেই প্রভাত হইল।

প্রভাত হইলে প্রফুল্ল বনের ভিতর এদিক-ওদিক বেড়াইতে লাগিল। পথে বাহির হইতে এখনো সাহস হয় না। দেখিল, একজায়গায় একটা পথের অস্পষ্ট রেখা বনের ভিতরের দিকে গিয়াছে। যখন পথের রেখা এদিকে গিয়াছে, তখন অবশ্য এদিকে মানুষের বাস আছে। প্রফুল্ল সেই পথে চলিল। বাড়ি ফিরিয়া যাইতে ভয়, পাছে বাড়ি হইতে আবার তাকে ডাকাইতে ধরিয়া আনে। বাঘ-ভালুকে খায়, সেও ভালো, আর ডাকাইতের হাতে না পড়িতে হয়।

পথের রেখা ধরিয়া প্রফুল্ল অনেক দূর গেল—বেলা দশ দণ্ড হইল, তবু গ্রাম পাইল না। শেষে পথের রেখা বিলুপ্ত হইল—আর পথ পায় না। কিন্তু দুই-একখানা পুরাতন ইট দেখিতে পাইল। ভরসা পাইল। মনে করিল, যদি ইট আছে, তবে অবশ্য নিকটে মনুষ্যালয় আছে।

যাইতে যাইতে ইটের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। জঙ্গল দুর্ভেদ্য হইয়া উঠিল। শেষে প্রফুল্ল দেখিল,

নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে এক বৃহৎ অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে। প্রফুল্ল ইষ্টকস্তূপের উপর আরোহণ করিয়া চারিদিক নিরীক্ষণ করিল। দেখিল, এখনও দুই-চারিটা ঘর অভগ্ন আছে। মনে করিল, এখানে মানুষ থাকিলেও থাকিতে পারে। প্রফুল্ল সেই সকল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিতে গেল। দেখিল, সকল ঘরের দ্বার খোলা—মনুষ্য নাই। অথচ মনুষ্যবাসের চিহ্নও কিছু কিছু আছে। ক্ষণপরে প্রফুল্ল কোনো বুড়ামানুষের কাতরানি শুনতে পাইল। শব্দ লক্ষ করিয়া প্রফুল্ল এক কুঠরিমধ্যে প্রবেশ করিল। দেখিল, সেখানে এক বুড়া শুইয়া কাতরাইতেছে। বুড়ার শীর্ণ দেহ, শুষ্ক ওষ্ঠ, চক্ষু কোটরগত, ঘন শ্বাস। প্রফুল্ল বুঝিল, ইহার মৃত্যু নিকট। প্রফুল্ল তাহার শয্যার কাছে গিয়া দাঁড়াইল।

বুড়া প্রায় শুষ্ককণ্ঠে বলিল, 'মা, তুমি কে? তুমি কি কোনো দেবতা, মৃত্যুকালে আমার উদ্ধারের জন্য আসিলে?'

প্রফুল্ল বলিল, 'আমি অনাথা। পথ ভুলিয়া এখানে আসিয়াছি। তুমিও দেখিতেছি অনাথ—তোমার কোনো উপকার করিতে পারি?'

বুড়া বলিল, 'অনেক উপকার এ সময়ে করিতে পার। জয় নন্দদুলাল! এ সময়ে মনুষ্যের মুখ দেখিতে পাইলাম। পিপাসায় প্রাণ যায়—একটু জল দাও।'

প্রফুল্ল দেখিল, বুড়ার ঘরে জল-কলসি আছে, কলসিতে জল আছে, জলপাত্র আছে; কেবল দিবার লোক নাই। প্রফুল্ল জল আনিয়া বুড়াকে খাওয়াইল।

বুড়া জল পান করিয়া কিছু সুস্থির হইল। প্রফুল্ল এই অরণ্যমধ্যে মুমূর্ষু বৃদ্ধকে একাকী এই অবস্থায় দেখিয়া বড় কৌতূহলী হইল। কিন্তু বুড়া তখন অধিক কথা কহিতে পারে না। প্রফুল্ল সুতরাং তাহার সবিশেষ পরিচয় পাইল না। বুড়া যে কয়টি কথা বলিল, তাহার মর্মার্থ এই:

বুড়া বৈষ্ণব। তাহার কেহ নাই, কেবল এক বৈষ্ণবী ছিল। বৈষ্ণবী বুড়াকে মুমূর্ষু দেখিয়া তাহার দ্রব্যসামগ্রী যাহা ছিল, তাহা লইয়া পলাইয়াছে। বুড়া বৈষ্ণব—তাহার দাহ হইবে না। বুড়ার কবর হয়—এই ইচ্ছা। বুড়ার কথামতো, বৈষ্ণবী বাড়ির উঠানে তাহার একটি কবর কাটিয়া রাখিয়া দিয়াছে। হয়ত শাবল কোদালি সেইখানে পড়িয়া আছে। বুড়া এখন প্রফুল্লের কাছে এই ভিক্ষা চাহিল যে, 'আমি মরিলে সেই কবরে আমাকে টানিয়া ফেলিয়া দিয়া মাটি চাপা দিও।'

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। তার পর বুড়া বলিতে লাগিল, 'আমার কিছু টাকা পোঁতা আছে। বৈষ্ণবী সে সন্ধান জানিত না—তাহা হইলে, না লইয়া পালাইত না। সে টাকাগুলি কাহাকে না দিয়া গেলে আমার প্রাণ বাহির হইবে না। যদি কাহাকে না দিয়া মরি, তবে যক্ষ হইয়া টাকার কাছে ঘুরিয়া বেড়াইব—আমার গতি হইবে না। বৈষ্ণবীকে সেই টাকা দিব মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু সে তো পলাইয়াছে। আর কোন মনুষ্যের সাক্ষাৎ পাইব? তাই তোমাকেই সেই টাকাগুলি দিয়া যাইতেছি। আমার বিছানার নিচে একখানা চৌকা তক্তা পাতা আছে। সেই তক্তাখানি তুলিবে। একটা সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইবে। বরাবর সিঁড়ি আছে। সেই সিঁড়ি দিয়া নামিবে—ভয় নাই—আলো লইয়া যাইবে। নিচে মাটির ভিতর এমনি একটা ঘর দেখিবে। সে ঘরের বায়ুকোণে খুঁজিও—টাকা পাইবে।'

প্রফুল্ল বুড়ার শুশ্রূষায় নিযুক্তা রহিল। বুড়া বলিল, 'এই বাড়িতে গোহাল আছে—গোহালে গরু আছে। গোহাল হইতে যদি দুধ দুইয়া আনিতে পার, তবে একটু আনিয়া আমাকে দাও, একটু আপনি খাও।'

প্রফুল্ল তাহাই করিল—দুধ আনিবার সময় দেখিয়া আসিল—কবর কাটা—সেখানে কোদালি শাবল পড়িয়া আছে।

অপরাহ্নে বুড়ার প্রাণবিয়োগ হইল। প্রফুল্ল তাহাকে তুলিল—বুড়া শীর্ণকায়; সুতরাং লঘু; প্রফুল্লের বল যথেষ্ট। প্রফুল্ল তাহাকে লইয়া গিয়া, কবরে শুয়াইয়া মাটি চাপা দিল। পরে নিকটস্থ কূপে স্নান করিয়া ভিজা কাপড় আধখানা পরিয়া রৌদ্রে শুকাইল। তার পরে কোদালি শাবল লইয়া বুড়ার টাকার সন্ধানে চলিল। বুড়া তাহাকে টাকা দিয়া গিয়াছে—সুতরাং লইতে কোনো বাধা আছে মনে করিল না। প্রফুল্ল দীন-দুঃখিনী।

নবম পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল বুড়াকে সমাধি-মন্দিরে প্রোথিত করিবার পূর্বেই তাহার শয্যা তুলিয়া বনে ফেলিয়া দিয়াছিল—দেখিয়াছিল যে, শয্যার নিচে যথার্থই একখানি চৌকা তক্তা, দীর্ঘে প্রস্থে তিন হাত হইবে, মেঝেতে বসানো আছে। এখন শাবল আনিয়া, তাহার চাড়ে তক্তা উঠাইল—অন্ধকার গহ্বর দেখা দিল। ক্রমে অন্ধকারে প্রফুল্ল দেখিল, নামিবার একটা সিঁড়ি আছে বটে।

জঙ্গলে কাঠের অভাব নাই। কিছু কাঠের চেলা উঠানে পড়িয়াছিল। প্রফুল্ল তাহা বহিয়া আনিয়া কতকগুলো গহ্বরমধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহার পর অনুসন্ধান করিতে লাগিল—চকমকি দিয়াশলাই আছে কি না। বুড়া মানুষ—অবশ্য তামাকু খাইত। সার ওয়াল্টার রালের আবিষ্ক্রিয়ার পর, কোন্ বুড়া তামাকু ব্যতীত এ ছার, এ নশ্বর, এ নীরস, এ দুর্বিষহ জীবন শেষ করিতে পারিয়াছে?—আমি গ্রন্থকার মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি যে, যদি এমন বুড়া কেহ ছিল, তবে তাহার মরা ভালো হয় নাই—তার আর কিছুদিন থাকিয়া এই পৃথিবীর দুর্বিষহ যন্ত্রণা ভোগ করাই উচিত ছিল। খুঁজিতে খুঁজিতে প্রফুল্ল চক্মকি, শোলা, দিয়াশলাই, সব পাইল। তখন প্রফুল্ল গোহাল উচাইয়া বিচালি লইয়া আসিল। চকমকির আগুনে বিচালি জ্বালিয়া সেই সরু সিঁড়িতে পাতালে নামিল। শাবল কোদালি আগে নিচে ফেলিয়া দিয়াছিল। দেখিল, দিব্য একটি ঘর। বায়ুকোণ—বায়ুকোণ আগে ঠিক করিল। তার পর যেসব কাঠ ফেলিয়া দিয়াছিল, তাহা বিচালির আগুনে জ্বালিল। উপরে মুক্ত পথ দিয়া ধুঁয়া বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। ঘর আলো হইল। সেইখানে প্রফুল্ল খুঁড়িতে আরম্ভ করিল।

খুঁড়িতে খুঁড়িতে 'ঠং' করিয়া শব্দ হইল। প্রফুল্লের শরীর রোমাঞ্চিত হইল—বুঝিল, ঘটি কি ঘড়ার গায়ে শাবল ঠেকিয়াছে। কিন্তু কোথা হইতে কার ধন এখানে আসিল, তার পরিচয় আগে দিই।

বুড়ার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ দাস। কৃষ্ণগোবিন্দ কায়স্থের সন্তান। সে স্বচ্ছন্দে দিনপাত করিত, কিন্তু অনেক বয়সে একটা সুন্দরী বৈষ্ণবীর হাতে পড়িয়া, রসকলি ও খঞ্জনিতে চিনি বিক্রীত করিয়া, ভেক লইয়া বৈষ্ণবীর সঙ্গে শ্রীবৃন্দাবন প্রয়াণ করিল। এখন শ্রীবৃন্দাবন গিয়া কৃষ্ণগোবিন্দের বৈষ্ণবী ঠাকুরানি, সেখানকার বৈষ্ণবদিগের মধুর জয়দেব-গীতি, শ্রীমদ্ভাগবতে পাণ্ডিত্য, আর নধর গড়ন দেখিয়া, তৎপাদপদ্মনিকর সেবনপূর্বক পুণ্যসঞ্চয়ে মন দিল। দেখিয়া, কৃষ্ণগোবিন্দ বৃন্দাবন পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবী লইয়া বাঙ্গালায় ফিরিয়া আসিলেন। কৃষ্ণগোবিন্দ তখন গরিব; বিষয়কর্মের অন্বেষণে মুর্শিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃষ্ণগোবিন্দের চাকরি জুটিল। কিন্তু তাঁহার বৈষ্ণবী যে বড় সুন্দরী, নবাবমহলে সে সংবাদ পৌঁছিল। একজন হাব্সি খোজা বৈষ্ণবীকে বেগম করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নিকেতনে যাতায়াত করিতে লাগিল। বৈষ্ণবী লোভে পড়িয়া রাজি হইল। আবার বেগোছ দেখিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ বাবাজি, বৈষ্ণবী লইয়া সেখান হইতে পলায়ন করিলেন। কিন্তু কোথায় যান? কৃষ্ণগোবিন্দ মনে করিলেন, এ অমূল্য ধন লইয়া লোকালয়ে বাস অনুচিত। কে কোন্ দিন কাড়িয়া লইবে। তখন বাবাজি বৈষ্ণবীকে পদ্মাপার লইয়া আসিয়া, একটা নিভৃত স্থান অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। পর্যটন করিতে করিতে এই ভগ্ন অট্টালিকায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন, লোকের চক্ষু হইতে তাঁর অমূল্য রত্ন লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে। এখানে যম ভিন্ন আর কাহারো সন্ধান রাখিবার সম্ভাবনা নাই। অতএব তাহারা সেইখানে রহিল। বাবাজি সপ্তাহে সপ্তাহে হাটে গিয়া বাজার করিয়া আনেন। বৈষ্ণবীকে কোথাও বাহির হইতে দেন না।

একদিন কৃষ্ণগোবিন্দ একটা নিচের ঘরে চুলা কাটিতেছিল—মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে একটা সেকেলে—তখনকার পক্ষেও সেকেলে মোহর পাওয়া গেল। কৃষ্ণগোবিন্দ সেখানে আরো খুঁড়িল। এক ভাঁড় টাকা পাইল।

এই টাকাগুলি না পাইলে কৃষ্ণগোবিন্দের দিন চলা ভার হইত। এক্ষণে স্বচ্ছন্দে দিনপাত হইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণগোবিন্দের এক নূতন জ্বালা হইল। টাকা পাইয়া তাহার স্মরণ হইল যে, এইরকম পুরাতন বাড়িতে অনেকে অনেক ধন মাটির ভিতর পাইয়াছে। কৃষ্ণগোবিন্দের দৃঢ় বিশ্বাস হইল, এখানে

আরো টাকা আছে। সেই অবধি কৃষ্ণগোবিন্দ অনুদিন প্রোথিত ধনের সন্ধান করিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে অনেক সুড়ঙ্গ, মাটির নিচে অনেক চোর-কুঠরি বাহির হইল। কৃষ্ণগোবিন্দ বাতিকগ্রস্তের ন্যায় সেই সকল স্থানে অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কিছু পাইল না। এক বৎসর এইরূপ ঘুরিয়া ঘুরিয়া কৃষ্ণগোবিন্দ কিছু শান্ত হইল। কিন্তু তথাপি মধ্যে মধ্যে নিচের চোর-কুঠরিতে গিয়া সন্ধান করিত। একদিন দেখিল, এক অন্ধকার ঘরে, এক কোণে একটা কী চকচক করিতেছে। দৌড়িয়া গিয়া তাহা তুলিল—দেখিল, মোহর! ইঁদুরে মাটি তুলিয়াছিল, সেই মাটির সঙ্গে উহা উঠিয়াছিল।

কৃষ্ণগোবিন্দ তখন কিছু করিল না, হাটবারের অপেক্ষা করিতে লাগিল। এবার হাটবারে বৈষ্ণবীকে বলিল, 'আমার বড় অসুখ করিয়াছে, তুমি হাট করিতে যাও।' বৈষ্ণবী সকালে হাট করিতে গেল। বাবাজি বুঝিলেন, বৈষ্ণবী একদিন ছুটি পাইয়াছে শীঘ্র ফিরিবে না। কৃষ্ণগোবিন্দ সেই অবকাশে সেই কোণ খুঁড়িতে লাগিল। সেখানে কুড়ি ঘড়া ধন বাহির হইল।

পূর্বকালে উত্তর-বাঙ্গালায়, নীলধ্বজবংশীয় প্রবলপরাক্রান্ত রাজগণ রাজ্য করিতেন। সে বংশে শেষ রাজা নীলাম্বর দেব। নীলাম্বরের অনেক রাজধানী ছিল—অনেক নগরে অনেক রাজভবন ছিল। এই একটি রাজভবন। এখানে বৎসরে দুই-এক সপ্তাহ বাস করিতেন। গৌড়ের বাদশাহ একদা উত্তর-বাঙ্গালা জয় করিবার ইচ্ছায় নীলাম্বরের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নীলাম্বর বিবেচনা করিলেন যে, কী জানি, যদি পাঠানেরা রাজধানী আক্রমণ করিয়া অধিকার করে, তবে পূর্বপুরুষদিগের সঞ্চিত ধনরাশি তাহাদের হস্তগত হইবে। আগে সাবধান হওয়া ভালো। এই বিবেচনা করিয়া যুদ্ধের পূর্বে নীলাম্বর অতি সঙ্গোপনে রাজভাণ্ডার হইতে ধনসকল এইখানে আনিলেন। স্বহস্তে তাহা মাটিতে পুঁতিয়া রাখিলেন। আর কেহ জানিল না যে কোথায় ধন রহিল। যুদ্ধে নীলাম্বর বন্দি হইলেন। পাঠান-সেনাপতি তাঁহাকে গৌড়ে চালান করিল। তারপর আর তাঁহাকে মনুষ্যলোকে কেহ দেখে নাই। তাঁহার শেষ কী হইল, কেহ জানে না। তিনি আর কখনো দেশে ফেরেন নাই। সেই অবধি তাঁহার ধনরাশি সেইখানে পোঁতা রহিল। সেই ধনরাশি কৃষ্ণগোবিন্দ পাইল। সুবর্ণ, হীরক, মুক্তা, অন্য রত্ন অসংখ্য— অগণ্য, কেহ স্থির করিতে পারে না কত। কৃষ্ণগোবিন্দ কুড়ি ঘড়া এইরূপ ধন পাইল।

কৃষ্ণগোবিন্দ ঘড়াগুলি সাবধানে পুঁতিয়া রাখিল। বৈষ্ণবীকে একদিনের তরেও এ ধরনের কথা কিছুই জানিতে দিল না। কৃষ্ণগোবিন্দ অতিশয় কৃপণ, ইহা হইতে একটি মোহর লইয়াও কখনো খরচ করিল না। এ ধন গায়ের রক্তের মতো বোধ করিত। সেই ভাঁড়ের টাকাতেই কায়ক্লেশে দিন চালাইতে লাগিল। সেই ধন এখন প্রফুল্ল পাইল। ঘড়াগুলি বেশ করিয়া পুঁতিয়া রাখিয়া আসিয়া প্রফুল্ল শয়ন করিল। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর, সেই বিচালির বিছানায় প্রফুল্ল শীঘ্রই নিদ্রায় অভিভূত হইল।

দশম পরিচ্ছেদ

এখন একটু ফুলমণির কথা বলি। ফুলমণি নাপিতানী হরিণীর ন্যায় বাছিয়া বাছিয়া দ্রুতপদ জীবে প্রাণ-সমর্পণ করিয়াছিল। ডাকাইতের ভয়ে দুর্লভচন্দ্র আগে আগে পলাইলেন, ফুলমণি পাছু পাছু ছুটিয়া গেল। কিন্তু দুর্লভের এমনই পলাইবার রোখ্ যে, তিনি পশ্চাদ্ধাবিতা প্রণয়িনীর কাছে নিতান্ত দুর্লভ হইলেন। ফুলমণি যত ডাকে, 'ও গো দাঁড়াও গো! আমায় ফেলে যেও না গো!' দুর্লভচন্দ্র তত ডাকে, 'ও বাবা গো! ঐ এল গো!' কাঁটাবনের ভিতর দিয়া, পগার লাফাইয়া, কাদা ভাঙিয়া, ঊর্ধ্বশ্বাসে দুর্লভ ছোটে—হায়! কাছা খুলিয়া গিয়াছে, এক পায়ের নাগরা জুতা কোথায় পড়িয়া গিয়াছে, চাদরখানা একটা কাঁটাবনে বিঁধিয়া তাঁহার বীরত্বের নিশানস্বরূপ বাতাসে উড়িতেছে। তখন ফুলমণি সুন্দরী হাঁকিল, 'ও অধঃপেতে মিন্‌সে—ওরে মেয়েমানুষকে ভুলিয়ে এনে—এমনি করে কি ডাকাতের হাতে সঁপে দিয়ে যেতে হয় রে মিন্‌সে?' শুনিয়া দুর্লভচন্দ্র ভাবিলেন, তবে নিশ্চিত ইহাকে ডাকাইতে ধরিয়াছে। অতএব দুর্লভচন্দ্র বিনাবাক্যব্যয়ে আরো বেগে ধাবমান হইলেন। ফুলমণি ডাকিল, 'ও

অধঃপেতে—ও পোড়ার মুখো—ও আঁটকুড়ির পুত—ও হাবাতে—ও ড্যাকরা—ও বিজলে!' ততক্ষণ দুর্লভ অদৃশ্য হইল। কাজেই ফুলমণিও গলাবাজি ক্ষান্ত দিয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল। রোদনকালে দুর্লভের মাতাপিতার প্রতি নানাবিধ দোষারোপ করিতে লাগিল।

এদিকে ফুলমণি দেখিল, কই—ডাকাইতেরা তো কেহ আসিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভাবিল—কান্না বন্ধ করিল। শেষ দেখিল, না ডকাইত আসে—না দুর্লভচন্দ্র দেখা দেয়। তখন জঙ্গল হইতে বাহির হইবার পথ খুঁজিতে লাগিল। তাহার ন্যায় চতুরার পক্ষে পথ পাওয়া বড় কঠিন হইল না। সহজেই বাহির হইয়া সে রাজপথে উপস্থিত হইল। কোথাও কেহ নাই দেখিয়া, সে গৃহাভিমুখে ফিরিল। দুর্লভের উপর তখন বড় রাগ।

অনেক বেলা হইলে ফুলমণি ঘরে পৌঁছিল। দেখিল, তাহার ভগিনী অলকমণি ঘরে নাই, স্নানে গিয়াছে। ফুলমণি কাহাকে কিছু না বলিয়া কপাট ভেজাইয়া শয়ন করিল। রাত্রে নিদ্রা হয় নাই—ফুলমণি শুইবামাত্র ঘুমাইয়া পড়িল।

তাহার দিদি আসিয়া তাহাকে উঠাইল—জিজ্ঞাসা করিল, 'কি লা, তুই এখন এলি?'

ফুলমণি বলিল, 'কেন, আমি কোথায় গিয়াছিলাম?'

অলকমণি। কোথায় আর যাবি? বামুনদের বাড়ি শুতে গিয়েছিলি, তা এত বেলা অবধি এলি না, তাই জিজ্ঞাসা করছি।

ফুল। তুই চোখের মাথা খেয়েছিস তার কী হবে? ভোরের বেলা তোর সমুখ দিয়ে এসে শুলেম—দেখিস নে?

অলকমণি বলিল, 'সে কী, বোন? আমি তোর বেলা দেখে তিনবার বামুনদের বাড়ি গিয়ে তোকে খুঁজে এলাম। তা তোকেও দেখলাম না—কাকেও দেখলাম না। হ্যাঁ লা! প্রফুল্ল আজ কোথা গেছে লা?'

ফুল। (শিহরিয়া) চুপ্ কর! দিদি চুপ্! ও কথা মুখে আনিস্ না।

অল। (সভয়ে) কেন, কী হয়েছে?

ফুল। সে কথা বলতে নেই।

অল। কেন লা?

ফুল। আমরা ছোটলোক—আমাদের দেবতা বামুনের কথায় কাজ কী, বোন?

অল। সে কী! প্রফুল্ল কী করেছে?

ফুল। প্রফুল্ল কি আর আছে?

অল। (পুনশ্চ সভয়ে) সে কী! কী বলিস্?

ফুল। (অতি অস্ফুটস্বরে) কারো সাক্ষাতে বলিস্ নে—কাল তার মা এসে তাকে নিয়ে গেছে।

ভগিনী। অ্যাঁ!

অলকমণির গা থরথর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ফুলমণি তখন এক আষাঢ়ে গল্প ফাঁদিল। ফুলমণি প্রফুল্লের বিছানায় রাত্রি তৃতীয় প্রহরের সময়ে তার মাকে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। ক্ষণপরেই ঘরের ভিতর একটা ভারি ঝড় উঠিল—তার পর আর কেহ কোথাও নাই। ফুলমণি মূর্ছিতা হইয়া দাঁতকপাটি লাগিয়া পড়িয়া রহিল। ইত্যাদি। ইত্যাদি। ফুলমণি উপন্যাসের উপসংহারকালে দিদিকে বিশেষ করিয়া সাবধান করিয়া দিল, 'এ সকল কথা কাহারো সাক্ষাতে বলিস্ না—দেখিস্, আমার মাথা খাস্!'

দিদি বলিলেন, 'না গো! এ কথা কি বলা যায়?' কিন্তু কথিতা দিদি মহাশয়া তখন চাল ধুইবার ছলে ধুচুনি হাতে পল্লি-পরিভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং ঘরে ঘরে উপন্যাসটি সালঙ্কার ব্যাখ্যা করিয়া, সকলকে সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেখ, এ-কথা প্রচার না হয়। কাজেই ইহা শীঘ্র প্রচারিত হইয়া রূপান্তরে প্রফুল্লের শ্বশুরবাড়ি গেল। রূপান্তর কিরূপ? পরে বলিব।

প্রভাতে উঠিয়া প্রফুল্ল ভাবিল, 'এখন কী করি? কোথায় যাই? এ নিবিড় জঙ্গল তো থাকিবার স্থান নয়, এখানে একা থাকিব কী প্রকারে? যাই বা কোথায়? বাড়ি ফিরিয়া যাইব? আবার ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইবে! আর যেখানে যাই, এ ধনগুলি লইয়া যাই কী প্রকারে? লোক দিয়া বহিয়া লইয়া গেলে, জানাজানি হবে, চোর-ডাকাইতে কাড়িয়া লইবে। লোকই বা পাইব কোথায়? যাহাকে পাইব, তাহাকেই বা বিশ্বাস কী? আমাকে মারিয়া ফেলিয়া টাকাগুলি কাড়িয়া লইতে কতক্ষণ? এ ধনের রাশির লোভ কে সম্বরণ করিবে?'

প্রফুল্ল অনেক বেলা অবধি ভাবিল। শেষে সিদ্ধান্ত এই হইল, 'অদৃষ্টে যাহাই হোক, দারিদ্র্য-দুঃখ আর সহ্য করিতে পারিব না। এইখানেই থাকিব। আমার পক্ষে দুর্গাপুরে আর এ জঙ্গলে তফাত কী? সেখানেও আমাকে ডাকাইতে ধরিয়া লইয়া যাইতেছিল, এখানেও নাহয় তাই করিবে।'

এইরূপ মনস্থির করিয়া প্রফুল্ল গৃহকর্মে প্রবৃত্ত হইল। ঘরদ্বার পরিষ্কার করিল। গরুর সেবা করিল, শেষে, রন্ধনের উদ্যোগ। রাঁধিবে কী? হাঁড়ি, কাঠ, চাল, দাল, সকলেরই অভাব। প্রফুল্ল একটি মোহর লইয়া হাটের সন্ধানে বাহির হইল। প্রফুল্লের যে সাহস অলৌকিক, তাহার পরিচয় অনেক দেওয়া হইয়াছে।

এ জঙ্গলে হাট কোথায়? প্রফুল্ল ভাবিল, 'সন্ধান করিয়া লইব।' জঙ্গলে পথের রেখা আছে, পূর্বেই বলিয়াছি। প্রফুল্ল সেই রেখা ধরিয়া চলিল।

যাইতে যাইতে নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটি ব্রাহ্মণের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ব্রাহ্মণের গায়ে নামাবলি, কপালে ফোঁটা, মাথা কামানো। ব্রাহ্মণ দেখিতে গৌরবর্ণ, অতিশয় সুপুরুষ, বয়স বড় বেশি নয়। ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইল। বলিল, 'কোথা যাইবে, মা?'

প্র। আমি হাটে যাইব।

ব্রাহ্মণ। এ দিকে হাটের পথ কোথা?

প্র। তবে কোন্ দিকে?

ব্র। তুমি কোথা হইতে আসিতেছ?

প্র। এই জঙ্গল হইতেই।

ব্রা। এই জঙ্গলে তোমার বাস?

প্র। হাঁ।

ব্রা। তবে তুমি হাটের পথ চেনো না?

প্র। আমি নূতন আসিয়াছি।

ব্রা। এ বনে কেহ ইচ্ছাপূর্বক আসে না। তুমি কেন আসিলে?

প্র। আমাকে হাটের পথ বলিয়া দিন।

ব্রা। হাট এক বেলার পথ। তুমি একা যাইতে পারিবে না। চোর-ডাকাইতের বড় ভয়। তোমার আর কে আছে?

প্র। আর কেহ নাই।

ব্রাহ্মণ অনেকক্ষণ ধরিয়া প্রফুল্লের মুখপানে চাহিয়া দেখিল। মনে মনে বলিল, 'এ বালিকা সকল সুলক্ষণযুক্তা। ভালো, দেখা যাউক, ব্যাপারটা কী?' প্রকাশ্যে বলিল, 'তুমি একা হাটে যাইও না। বিপদে পড়িবে। এইখানে আমার একখানা দোকান আছে। যদি ইচ্ছা হয়, তবে সেখান হইতে চাল দাল কিনিতে পার।'

প্রফুল্ল বলিল, 'সেই হলে ভালো হয়। কিন্তু আপনাকে তো ব্রাহ্মণপণ্ডিতের মতো দেখিতেছি।'

ব্রা। ব্রাহ্মণপণ্ডিত অনেক রকমের আছে। বাছা! তুমি আমার সঙ্গে এস।

এই বলিয়া ব্রাহ্মণ প্রফুল্লকে সঙ্গে করিয়া আরো নিবিড়তর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। প্রফুল্লের

একটু একটু ভয় করিতে লাগিল, কিন্তু এ বনে কোথায় বা ভয় নাই? দেখিল, সেখানে একখানি কুটির আছে—তালাচাবি বন্ধ, কেহ নাই। ব্রাহ্মণ তালাচাবি খুলিল। প্রফুল্ল দেখিল—দোকান নয়, তবে হাঁড়ি, কলসি, চাল, দাল, নুন, তেল যথেষ্ট আছে। ব্রাহ্মণ বলিল, 'তুমি যাহা একা বহিয়া লইয়া যাইতে পার, লইয়া যাও।'

প্রফুল্ল যাহা পারিল, তাহা লইল। জিজ্ঞাসা করিল, 'দাম কত দিতে হইবে?'

ব্রা। এক আনা।

প্র। আমার নিকট পয়সা নাই।

ব্রা। টাকা আছে? দাও, ভাঙাইয়া দিতেছি।

প্র। আমার কাছে টাকাও নাই।

ব্রা। তবে কী নিয়া হাটে যাইতেছিলে?

প্র। একটি মোহর আছে।

ব্রা। দেখি।

প্রফুল্ল মোহর দেখাইল। ব্রাহ্মণ তাহা দেখিয়া ফিরাইয়া দিল ; বলিল, 'মোহর ভাঙাইয়া দিই, এত টাকা আমার কাছে নাই। চল, তোমার সঙ্গে তোমার ঘরে যাই, তুমি সেইখানে আমাকে পয়সা দিও।'

প্র। ঘরেও আমার পয়সা নাই।

ব্রা। সবই মোহর! তা হৌক, চল, তোমার ঘর চিনিয়া আসি। যখন তোমার হাতে পয়সা হইবে, তখন আমায় দিও। আমি গিয়া নিয়া আসিব।

এখন 'সবই মোহর' কথাটা প্রফুল্লের কানে ভালো লাগিল না। প্রফুল্ল বুঝিল যে, এ চতুর ব্রাহ্মণ বুঝিয়াছে যে, প্রফুল্লের অনেক মোহর আছে। আর সেই লোভেই তাহার বাড়ি দেখিতে যাইতে চাহিতেছে। প্রফুল্ল জিনিসপত্র যাহা লইয়াছিল, তাহা রাখিল। বলিল, 'আমাকে হাটেই যাইতে হইবে। আমার কাপড়চোপড়ের বরাত আছে।'

ব্রাহ্মণ হাসিল। বলিল, 'মা! মনে করিতেছ, আমি তোমার বাড়ি চিনিয়া আসিলে, তোমার মোহরগুলি চুরি করিয়া লইব? তা তুমি কি মনে করিয়াছ, হাটে গেলেই আমাকে এড়াইতে পারিবে? আমি তোমার সঙ্গ না ছাড়িলে তুমি ছাড়িবে কী প্রকারে?'

সর্বনাশ! প্রফুল্লের গা কাঁপিতে লাগিল।

ব্রাহ্মণ বলিল, 'তোমার সঙ্গে আমি প্রতারণা করিব না। আমাকে ব্রাহ্মণপণ্ডিত মনে কর, আর যাই মনে কর, আমি ডাকাইতের সর্দার। আমার নাম ভবানী পাঠক।'

প্রফুল্ল স্পন্দহীন। ভবানী পাঠকের নাম সে দুর্গাপুরেও শুনিয়াছিল। ভবানী পাঠক বিখ্যাত দস্যু। তাহার ভয়ে বরেন্দ্রভূমি কম্পমান। প্রফুল্লের বাক্যস্ফূর্তি হইল না।

ভবানী বলিল, 'বিশ্বাস না হয়, প্রত্যক্ষ দেখ।'

এই বলিয়া ভবানী ঘরের ভিতর হইতে একটা নাগরা বা দামামা বাহির করিয়া তাহাতে গোটাকতক ঘা দিল। মুহূর্তমধ্যে জন পঞ্চাশ–ষাট কালান্তক যমের মতো জওয়ান লাঠি সড়কি লইয়া উপস্থিত হইল। তাহারা ভবানীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'কী আজ্ঞা হয়?'

ভবানী বলিল, 'এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে আমি মা বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে মা বলিবে এবং মা'র মতো দেখিবে। তোমরা ইহার কোনো অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না। এখন তোমরা বিদায় হও।' এই বলিবামাত্র সেই দস্যুদল মুহূর্তমধ্যে অন্তর্হিত হইল।

প্রফুল্ল বড় বিস্মিত হইল। প্রফুল্ল স্থিরবুদ্ধি ; একেবারেই বুঝিল যে, ইহার শরণাগত হওয়া ভিন্ন আর উপায় নাই। বলিল, 'চলুন, আপনাকে আমার বাড়ি দেখাইতেছি।'

প্রফুল্ল দ্রব্যসামগ্রী যাহা রাখিয়াছিল, তাহা আবার লইল। সে আগে চলিল, ভবানী পাঠক পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। তাহারা সেই ভাঙা বাড়িতে উপস্থিত হইল। বোঝা নামাইয়া ভবানী ঠাকুরকে বসিতে, প্রফুল্ল একখানা ছেঁড়া কুশাসন দিল। বৈরাগীর একখানি ছেঁড়া কুশাসন ছিল।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী পাঠক বলিল, 'এই ভাঙা বাড়িতে তুমি মোহর পাইয়াছ?'

প্র। আজ্ঞা হাঁ।

ভ। কত?

প্র। অনেক।

ভ। ঠিক বল কত? ভাঁড়াভাঁড়ি করিলে আমার লোক আসিয়া বাড়ি খুঁজিয়া দেখিবে।

প্র। কুড়ি ঘড়া।

ভ। এ ধন লইয়া তুমি কী করিবে?

প্র। দেশে লইয়া যাইব।

ভ। রাখিতে পারিবে?

প্র। আপনি সাহায্য করিলে পারি।

ভ। এই বনে আমার পূর্ণ অধিকার। এই বনের বাহিরে আমার তেমন ক্ষমতা নাই। এ বনের বাহিরে ধন লইয়া গেলে, আমি রাখিতে পারিব না।

প্র। তবে আমি এই বনেই এই ধন লইয়া থাকিব। আপনি রক্ষা করিবেন?

ভ। করিব। কিন্তু তুমি এত ধন লইয়া কী করিবে?

প্র। লোকে ঐশ্বর্য লইয়া কী করে?

ভ। ভোগ করে।

প্র। আমিও ভোগ করিব।

ভবানী ঠাকুর 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিল। প্রফুল্ল অপ্রতিভ হইল। দেখিয়া ভবানী বলিল, 'মা! বোকা মেয়ের মতো কথাটা বলিলে, তাই হাসিলাম। তোমার তো কেহই নাই বলিয়াছ, তুমি কাকে নিয়া এ ঐশ্বর্য ভোগ করিবে? একা কি ঐশ্বর্য ভোগ হয়?'

প্রফুল্ল অধোবদন হইল। ভবানী বলিতে লাগিল, 'শোন। লোকে ঐশ্বর্য লইয়া কেহ ভোগ করে, কেহ পুণ্যসঞ্চয় করে, কেহ নরকের পথ সাফ করে। তোমার ভোগ করিবার জো নাই। কেননা, তোমার কেহ নাই। তুমি পুণ্যসঞ্চয় করিতে পার, নাহয় নরকের পথ সাফ করিতে পার। কোন্‌টা করিবে?'

প্রফুল্ল বড় সাহসী। বলিল, 'এ সকল কথা তো ডাকাইতের সর্দারের মতো নহে।'

ব্রা। না; আমি কেবল ডাকাইতের সর্দার নহি। তোমার কাছে আর আমি ডাকাইতের সর্দার নহি, তোমাকে আমি মা বলিয়াছি, সুতরাং আমি এক্ষণে তোমার পক্ষে ভালো যা, তাই বলিব। ধনের ভোগ তোমার হইতে পারে না—কেননা, তোমার কেহ নাই। তবে এই ধনের দ্বারা বিস্তর পাপ, অথবা বিস্তর পুণ্য সঞ্চয় করিতে পার। কোন্ পথে যাইতে চাও?

প্র। যদি বলি, পাপই করিব?

ব্রা। আমি তাহা হইলে, লোক দিয়া তোমার ধন তোমার সঙ্গে দিয়া তোমাকে এ বনের বাহির করিয়া দিব। এ বনে আমার অনুচর এমন অনেক আছে যে, তোমার এই ধনের লোভে তোমার সঙ্গে পাপাচরণ করিতে সম্মত হইবে। অতএব তোমার সে মতি হইলে, আমি তোমাকে এই দণ্ডে এখান হইতে বিদায় করিতে বাধ্য। এ বন আমারই।

প্র। লোক দিয়া আমার ধন আমার সঙ্গে পাঠাইয়া দেন, তবে সে আমার পক্ষে ক্ষতি কী?

ভ। রাখিতে পারিবে কি? তোমার রূপ আছে, যৌবন আছে, যদিও ডাকাইতের হাতে উদ্ধার পাও—কিন্তু রূপ-যৌবনের হাতে উদ্ধার পাইবে না। পাপের লালসা না ফুরাইতে ফুরাইতে ধন ফুরাইবে। যতই কেন ধন থাক্ না, শেষ করিলে শেষ হইতে বিস্তর দিন লাগে না। তার পর, মা?

প্র। তার পর কী?

ভ। নরকের পথ সাফ। লালসা আছে, কিন্তু লালসাপরিতৃপ্তির উপায় নাই—সেই নরকের পরিষ্কার পথ। পুণ্য সঞ্চয় করিবে?

প্র। বাবা ! আমি গৃহস্থের মেয়ে, কখনো পাপ জানি না। আমি কেন পাপের পথে যাইব ? আমি বড় কাঙাল—আমার অন্নবস্ত্র জুটিলেই ঢের, আমি ধন চাই না—দিনপাত হইলেই হইল। এ ধন তুমি সব নাও—আমি নিষ্পাপে যাতে একমুঠো অন্ন পাই তাই ব্যবস্থা করিয়া দাও।

ভবানী মনে মনে প্রফুল্লকে ধন্যবাদ করিল। প্রকাশ্যে বলিল, 'ধন তোমার। আমি লইব না।'

প্রফুল্ল বিস্মিত হইল। মনের ভাব বুঝিয়া ভবানী বলিল, 'তুমি ভাবিতেছ, ডাকাইতি করে, পরের ধন কাড়িয়া খায়, আবার এরকম ভান কেন ? সে কথা তোমায় এখন বলিবার প্রয়োজন নাই। তবে তুমি যদি পাপাচরণে প্রবৃত্ত হও, তবে তোমার এ ধন লুঠ করিয়া লইলেও লইতে পারি। এখন এ ধন লইব না। তোমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিতেছি—এ ধন লইয়া তুমি কী করিবে ?'

প্র। আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখাইয়া দিন, ধন লইয়া কী করিব।

ভ। শিখাইতে পাঁচ-সাত বৎসর লাগিবে। যদি শেখ, আমি শিখাইতে পারি। এই পাঁচ-সাত বৎসর তুমি ধন স্পর্শ করিবে না। তোমার ভরণপোষণের কোনো কষ্ট হইবে না। তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে। কেমন, স্বীকৃত আছ ?

প্র। বাস করিব কোথায় ?

ভ। এইখানে। ভাঙাচোরা একটু একটু মেরামত করিয়া দিব।

প্র। এইখানে একা বাস করিব ?

ভ। না, আমি দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিব। তাহারা তোমার কাছে থাকিবে। কোনো ভয় করিও না। এ বনে আমি কর্তা। আমি থাকিতে তোমার কোনো অনিষ্ট ঘটিবে না।

প্র। আপনি কিরূপে শিখাইবেন ?

ভ। তুমি লিখিতে-পড়িতে জানো ?

প্র। না।

ভ। তবে প্রথমে লেখাপড়া শিখাইব।

প্রফুল্ল স্বীকৃত হইল। এ অরণ্যমধ্যে একজন সহায় পাইয়া সে আহ্লাদিত হইল।

ভবানী ঠাকুর বিদায় হইয়া সেই ভগ্ন অট্টালিকার বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, এক ব্যক্তি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছে। তাহার বলিষ্ঠ গঠন, চৌগোঁপ্পা ও ছাঁটা গালপাট্টা আছে। ভবানী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রঙ্গরাজ ! এখানে কেন ?'

রঙ্গরাজ বলিল, 'আপনার সন্ধানে। আপনি এখানে কেন ?'

ভ। যা এতদিন সন্ধান করিতেছিলাম, তাহা পাইয়াছি।

রঙ্গ। রাজা ?

ভ। রানি।

রঙ্গ। রাজা রানি আর খুঁজিতে হইবে না। ইংরেজ রাজা হইতেছে। কলিকাতায় নাকি হস্টিন* বলিয়া একজন ইংরেজ ভালো রাজ্য ফাঁদিয়াছে।

ভ। আমি সেরকম রাজা খুঁজি না। আমি খুঁজি যা, তা তো তুমি জানো।

রঙ্গ। এখন পাইয়াছেন কি ?

ভ। সে সামগ্রী পাইবার নয়, তৈয়ার করিয়া লইতে হইবে। জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষে কাটারি গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভালো পাইয়াছি ; এখন পাঁচ-সাত বৎসর ধরিয়া গড়িতে শাণিতে হইবে। দেখিও, এই বাড়িতে আমি ভিন্ন আর কোনো পুরুষমানুষ না প্রবেশ করিতে পায়। মেয়েটি যুবতী এবং সুন্দরী।

রঙ্গ। যে আজ্ঞা। সম্প্রতি ইজারাদারের লোক রঞ্জনপুর লুঠিয়াছে। তাই আপনাকে খুঁজিতেছি।

ভ। চল, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া, গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি। গ্রামের লোক আনুকূল্য করিবে ?

রঙ্গ। বোধহয় করিতে পারে।

ওয়ারেন হেস্টিংস

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

ভবানী ঠাকুর অঙ্গীকারমতো দুইজন স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন। একজন হাটে ঘাটে যাইবে, আর একজন প্রফুল্লের কাছে অনুক্ষণ থাকিবে। দুইজন দুই রকমের। যে হাটে ঘাটে যাইবে, তাহার নাম গোবরার মা, বয়স তিয়াত্তর বছর, কালো আর কালা। যদি একেবারে কানে না শুনিত, ক্ষতি ছিল না, কোনোমতে ইশারা ইঙ্গিতে চলিত ; কিন্তু এ তা নয়। কোনো কোনো কথা কখনো কখনো শুনিতে পায়, কখনো কোনো কথা শুনিতে পায় না। এরকম হইলে বড় গণ্ডগোল বাধে।

যে কাছে থাকিবার জন্য আসিয়াছিল, সে সম্পূর্ণরূপে ভিন্নপ্রকৃতির স্ত্রীলোক। বয়সে প্রফুল্লের অপেক্ষা পাঁচ-সাত বৎসরের বড় হইবে—উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ—বর্ষাকালের কচি পাতার মতো রঙ। রূপ উছলিয়া পড়িতেছে।

দুইজনে একত্র আসিল—যেন পূর্ণিমা অমাবস্যার হাত ধরিয়াছে। গোবরার মা প্রফুল্লকে প্রণাম করিল। প্রফুল্ল জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নাম কী গা?'

গোবরার মা শুনিতে পাইল না ; অপরা বলিল, 'ও একটু কালা—ওকে সবাই গোবরার মা বলে।'

প্র। গোবরার মা! তোমার কয়টি ছেলে গা?

গোবরার মা। আমি ছিলেম আর কোথায়? বাড়িতে ছিলেম।

প্র। তুমি কী জেতের মেয়ে?

গোবরার মা। যেতে আসতে খুব পারব। যেখানে বলিবে, সেইখানেই যাব।

প্র। বলি, তুমি কী লোক?

গোবরার মা। আর তোমার লোকে কাজ কী মা! আমি একাই তোমার সব কাজ করে দেব। কেবল দুই-একটা কাজ পারব না।

প্র। পারবে না, কী?

গোবরার মা'র কান ফুটিল। বলিল, 'পারব না, কী? এই জল তুলতে পারব না। আমার কাঁকালে জোর নাই। আর কাপড়চোপড় কাচা—তা নাহয় মা, তুমিই কোরো।'

প্র। আর সব পারবে তো?

গো-মা। বাসনটাসনগুলো মাজা—তাও নাহয় তুমি আপনিই করলে।

প্র। তাও পারবে না ; তবে পারবে কী?

গো-মা। আর এমন কিছু না—এই ঘর ঝেঁটোন, ঘর নিকোন, এটাও বড় পারি নে।

প্র। পারবে কী?

গো-মা। আর যা বল। সলতে পাকব, জল গড়িয়ে দেব, আমার এঁটো পাতা ফেলব—আর আসল কাজ যা যা, তা করব—হাট করব।

প্র। বেসাতির হিসাবটা দিতে পারবে?

গো-মা। তা মা, আমি বুড়োমানুষ, হালা কালা, আমি কি অত পারি! তবে কড়িপাতি যা দেবে, তা সব খরচ করে আসব—তুমি বলতে পাবে না যে, আমার এই খরচটা হল না।

প্র। বাছা, তোমার মতো গুণের লোক পাওয়া ভার।

গো-মা। তা মা, যা বল, তোমার আপনার গুণে বল।

প্রফুল্ল অপরাকে তখন বলিল, 'তোমার নাম কী গা?'

নবাগতা সুন্দরী বলিল, 'তা ভাই, জানি না।'

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, 'সে কী ! বাপ-মায় কি নাম রাখে নাই?'

সুন্দরী বলিল, 'রাখাই সম্ভব। কিন্তু আমি সবিশেষ অবগত নহি।'

প্র। সে কী গো?

সুন্দরী। জ্ঞান হইবার আগে হইতে আমি বাপ-মা'র কাছছাড়া। ছেলেবেলায় আমায় ছেলেধরায় চুরি

করিয়া লইয়া গিয়াছিল।

প্র। বটে। তা তারাও তো একটা নাম রেখেছিল?

সুন্দরী। নানা রকম।

প্র। কী কী?

সুন্দরী। পোড়ারমুখী, লক্ষ্মীছাড়া, হতভাগী, চুলোমুখী।

এতক্ষণ গোবরার মা আবার কান হারাইয়াছিল। এই কয়টা সদাশ্রুত গুণবাচক শব্দে শ্রুতি জাগরিত হইল। সে বলিল, 'যে আমায় পোড়ারমুখী বলে, সেই পোড়ারমুখী; যে আমায় চুলোমুখী বলে, সেই চুলোমুখী; যে আমায় আঁটকুড়ি বলে, সেই আঁটকুড়ি—

সুন্দরী। (হাসিয়া) আঁটকুড়ি বলি নাই, বাছা!

গো-মা। তুই আঁটকুড়ি বলিলেও বলেছিস, না বলিলেও বলেছিস—কেন বলবি না?

প্রফুল্ল হাসিয়া বলিল, 'তোমাকে বলচে না গো—ও আমাকে বলচে।'

তখন নিশ্বাস ফেলিয়া গোবরার মা বলিল, 'ও কপাল! আমাকে না? তা বলুক মা, বলুক, তুমি রাগ করো না! ও বামনীর মুখটা বড় কদুয্যি। তা বাছা! রাগ করতে নেই।' গোবরার মা'র মুখে এইরূপ আত্মপক্ষে বীররস ও পক্ষান্তরে শান্তিরসের অবতারণা শুনিয়া যুবতীদ্বয় প্রীতা হইলেন। প্রফুল্ল অপরাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বামনী? তা আমাকে এতক্ষণ বল নাই? আমার প্রণাম করা হয় নাই।' প্রফুল্ল প্রণাম করিল।

বয়স্যা আশীর্বাদ করিয়া বলিল, 'আমি বামনের মেয়ে বটে—এইরূপ শুনিয়াছি—কিন্তু বামনী নই।'

প্র। সে কী?

বয়স্যা। বামন জোটে নাই।

প্র। বিবাহ হয় নাই? সে কী?

বয়স্যা। ছেলেধরায় কি বিয়ে দেয়?

প্র। চিরকাল তুমি ছেলেধরার ঘরে?

বয়স্যা। না, ছেলেধরায় এক রাজার বাড়ি বেচে এয়েছিল।

প্র। রাজারা বিয়ে দিল না?

বয়স্যা। রাজপুত্র ইচ্ছুক ছিলেন—কিন্তু বিবাহটা গান্ধর্বমত।

প্র। নিজে পাত্র বুঝি?

বয়স্যা। তাও কয় দিনের জন্য বলিতে পারি না।

প্র। তারপর?

বয়স্যা। রকম দেখিয়া পলায়ন করিলাম।

প্র। তার পর?

বয়স্যা। রাজমহিষী কিছু গহনা দিয়াছিলেন, গহনা-সমেত পলাইয়াছিলাম। সুতরাং ডাকাইতের হাতে পড়িলাম। সে ডাকাইতের দলপতি ভবানী ঠাকুর, তিনি আমার কাহিনী শুনিয়া আমার গহনা লইলেন না, বরং আরো কিছু দিলেন। আপনার গৃহে আমায় আশ্রয় দিলেন। আমি তাঁহার কন্যা, তিনি আমার পিতা। তিনিও আমাকে একপ্রকার সম্প্রদান করিয়াছেন।

প্র। একপ্রকার কী?

বয়স্যা। সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে।

প্র। সে কীরকম?

বয়স্যা। রূপ, যৌবন, প্রাণ।

প্র। তিনিই তোমার স্বামী?

বয়স্যা। হাঁ—কেন না, যিনি সম্পূর্ণরূপে আমার অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।

প্রফুল্ল দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'বলিতে পারি না। কখনো স্বামী দেখ নাই, তাই

বলিতেছ—স্বামী দেখিলে কখনো শ্রীকৃষ্ণে মন উঠিত না।'

মূর্খ ব্রজেশ্বর এত জানিত না।

বয়স্যা বলিল, 'শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেননা, তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত, গুণ অনন্ত।'

এ যুবতী ভবানী ঠাকুরের চেলা, কিন্তু প্রফুল্ল নিরক্ষর—এ কথার উত্তর দিতে পারিল না। হিন্দুধর্মপ্রণেতারা উত্তর জানিতেন। ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎপিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ! স্বামী আরো পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দুসমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।

প্রফুল্ল মূর্খ মেয়ে, কিছু বুঝিতে পারিল না। বলিল, 'আমি অত কথা ভাই, বুঝিতে পারি না। তোমার নামটি কী, এখনো তো বলিলে না?'

বয়স্যা বলিল, 'ভবানী ঠাকুর নাম রাখিয়াছেন নিশি, আমি দিবার বহিন নিশি। দিবাকে একদিন আলাপ করিতে লইয়া আসিব। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, শোন। ঈশ্বরই পরমস্বামী। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা, শ্রীকৃষ্ণ সকলের দেবতা। দুটো দেবতা কেন, ভাই? দুই ঈশ্বর? এ ক্ষুদ্র প্রাণের ক্ষুদ্র ভক্তিটুকুকে দুই ভাগ করিলে কতটুকু থাকে?'

প্র। দূর! মেয়েমানুষের ভক্তির কি শেষ আছে?

নিশি। মেয়েমানুষের ভালোবাসার শেষ নাই। ভক্তি এক, ভালোবাসা আর।

প্র। আমি তা আজো জানিতে পারি নাই। আমার দুই নূতন।

প্রফুল্লের চক্ষু দিয়া ঝরঝর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। নিশি বলিল, 'বুঝিয়াছি বোন্—তুমি অনেক দুঃখ পাইয়াছ।' তখন নিশি প্রফুল্লের গলা জড়াইয়া ধরিয়া তার চক্ষের জল মুছাইল। বলিল, 'এত জানিতাম না।' নিশি তখন বুঝিল, ঈশ্বরভক্তির প্রথম সোপান পতিভক্তি।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

যে রাত্রে দুর্লভ চক্রবর্তী প্রফুল্লকে তাহার মাতার বাড়ি হইতে ধরিয়া লইয়া যায়, দৈবগতিকে ব্রজেশ্বর সেই রাত্রেই প্রফুল্লের বাসস্থান দুর্গাপুরে গিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। ব্রজেশ্বরের একটি ঘোড়া ছিল, ঘোড়ায় চড়িতে ব্রজেশ্বর খুব মজবুত। যখন বাড়ির সকলে ঘুমাইল, ব্রজেশ্বর গোপনে সেই অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অন্ধকারে দুর্গাপুরে প্রস্থান করিলেন। যখন তিনি প্রফুল্লের কুটিরে উপস্থিত হইলেন, তখন সে ভবন জনশূন্য অন্ধকারময়। প্রফুল্লকে দস্যুতে লইয়া গিয়াছে। সেই রাত্রে ব্রজেশ্বর পাড়াপড়শী কাহাকেও পাইলেন না যে, জিজ্ঞাসা করেন।

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে না-দেখিতে পাইয়া মনে করিল যে, প্রফুল্ল একা থাকিতে না পারিয়া কোনো কুটুম্ববাড়ি গিয়াছে। ব্রজেশ্বর অপেক্ষা করিতে পারিল না। বাপের ভয়, রাত্রিমধ্যেই ফিরিয়া আসিল।

তারপর কিছুদিন গেল। হরবল্লভের সংসার যেমন চলিতেছিল, তেমনি চলিতে লাগিল। সকলে খায় দায় বেড়ায়—সংসারের কাজ করে। ব্রজেশ্বরের দিন কেবল ঠিক সেরকম যায় না। হঠাৎ কেহ কিছু বুঝিল না—জানিল না। প্রথমে মা জানিল। গৃহিণী দেখিল, ছেলের পাতে দুধের বাটিতে দুধ পড়িয়া থাকে, মাছের মুড়ার কেবল কণ্ঠার মাছটাই ভুক্ত হয়, 'রান্না ভালো হয় না' বলিয়া, ব্রজ ব্যঞ্জন ঠেলিয়া রাখে। মা মনে করিলেন, 'ছেলের মন্দাগ্নি হইয়াছে।' প্রথমে জারক লেবু প্রভৃতি টোটকার ব্যবস্থা করিলেন, তারপর কবিরাজ ডাকিবার কথা হইল। ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল। মাকে ব্রজ হাসিয়া উড়াইয়া দিল, কিন্তু ব্রহ্মঠাকুরানিকে পারিল না। বুড়ি ব্রজেশ্বরকে একদিন একা পাইয়া চাপিয়া ধরিল।

'হ্যাঁ রে ব্রজ, তুই আর নয়ানবৌয়ের মুখ দেখিস না কেন?'

ব্রজ হাসিয়া বলিল, 'মুখখানি একে অমাবস্যার রাত্রি, তাতে মেঘ ঝড় ছাড়া নেই—দেখিতে বড় সাধ নেই।'

ব্রহ্ম। তা মরুক গে, সে নয়নবৌ বুঝবে—তুই খাস নে কেন?

ব্রজ। তুমি যে রাঁধ!

ব্রহ্ম। আমি তো চিরকালই এমনি রাঁধি।

ব্রজ। আজকাল হাত পেকেছে।

ব্রহ্ম। দুধও বুঝি আমি রাঁধি? সেটাও কি রান্নার দোষ?

ব্রজ। গরুগুলোর দুধ বিগড়ে গিয়াছে।

ব্রহ্ম। তুই হাঁ করে রাতদিন ভাবিস কী?

ব্রজ। কবে তোমায় গঙ্গায় নিয়ে যাব।

ব্রহ্ম। আর তোর বড়াইয়ে কাজ নাই। মুখে অমন অনেকে বলে! শেষে এই নিমগাছের তলায় আমায় গঙ্গায় দিবি—তুলসী গাছটাও দেখতে পাব না! তা তুই ভাব না যা হয়— কিন্তু তুই আমার গঙ্গা ভেবে ভেবে এত রোগা হয়ে গেলি কেন?

ব্রজ। ওটা কি কম ভাবনা?

ব্রহ্ম। কাল নাইতে গিয়ে বানায় বসে কী, ভাই, ভাবছিলি? চোখ দিয়ে জল পড়ছিল কেন?

ব্রজ। ভাবছিলাম যে, স্নান করেই তোমার রান্না খেতে হবে। সেই দুঃখে চোখে জল এসেছিল।

ব্রহ্ম। সাগর এসে রেঁধে দিবে? তা হলে খেতে পারবি তো?

ব্রজ। কেন, সাগর তো রোজ রাঁধিত? খেলাঘরে যাও নি কোনো দিন? ধূলা-চড়চড়ি, কাদার সুক্ত, ইটের ঘণ্ট—এক দিন আপনি খেয়ে দেখ না? তার পর আমায় খেতে বোলো।

ব্রহ্ম। প্রফুল্ল এসে রেঁধে দিবে?

যেমন পথে কেহ প্রদীপ লইয়া যখন চলিয়া যায়, তখন পথিপার্শ্বস্থ অন্ধকার ঘরের উপর সেই আলো পড়িলে, ঘর একবার হাসিয়া আবার তখনই আঁধার হয়, প্রফুল্লের নামে ব্রজেশ্বরের মুখ তেমনই হইল। ব্রজ উত্তর করিল, 'বাগদি যে।'

ব্রহ্ম। বাগদি না। সবাই জানে, সে মিছে কথা। তোমার বাপের কেবল সমাজের ভয়। ছেলের চেয়ে কিছু সমাজ বড় নয়। কথাটা আবার পাড়ব?

ব্রজ। না, আমার জন্য সমাজে আমার বাপের অপমান হবে—তাও কি হয়?

সেদিন আর বেশি কথা হইল না। ব্রহ্মঠাকুরানিও সবটুকু বুঝিতে পারিলেন না। কথাটা বড় সোজা নয়। প্রফুল্লের রূপ অতুলনীয়—একে তো রূপেই সে ব্রজেশ্বরের হৃদয় অধিকার করিয়া বসিয়াছিল, আবার সেই একদিনেই ব্রজেশ্বর দেখিয়াছিলেন, প্রফুল্লের বাহির অপেক্ষা ভিতর আরো সুন্দর, আরো মধুর। যদি প্রফুল্ল—বিবাহিতা স্ত্রী—স্বাধিকারপ্রাপ্ত হইয়া নয়নতারার মতো কাছে থাকিত, তবে এই উন্মাদকর মোহ সুস্নিগ্ধ স্নেহে পরিণত হইত। রূপের মোহ কাটিয়া যাইত, গুণের মোহ থাকিয়া যাইত। কিন্তু তা হইল না। প্রফুল্ল-বিদ্যুৎ একবার চমকাইয়া, চিরকালের জন্য অন্ধকারে মিশিল, সেইজন্য সেই মোহ সহস্রগুণে বল পাইল। কিন্তু এ তো গেল সোজা কথা। কঠিন এই যে, ইহার উপর দারুণ করুণা। সেই সোনার প্রতিমাকে তাহার অধিকারে বঞ্চিত করিয়া, অপমান করিয়া, মিথ্যা অপবাদ দিয়া, চিরকালের জন্য বহিষ্কৃত করিয়া দিতে হইয়াছে। সে এখন অন্নের কাঙাল। বুঝি না-খাইয়া মরিয়া যাইবে! যখন সেই প্রগাঢ় অনুরাগের উপর এই গভীর করুণা—তখন মাত্রা পূর্ণ। ব্রজেশ্বরের হৃদয় প্রফুল্লময়—আর কিছুরই স্থান নাই। বুড়ি এত কথাও বুঝিল না।

কিছুদিন পরে ফুলমণি নাপিতানীর প্রচারিত প্রফুল্লের তিরোধান-বৃত্তান্ত হরবল্লভের গৃহে পৌঁছিল। গল্প মুখে মুখে বদল হইতে হইতে চলে। সংবাদটা এখানে এইরূপ আকারে পৌঁছিল যে, প্রফুল্ল বাত-শ্লেষ্মা-বিকারে মরিয়াছে—মৃত্যুর পূর্বে তার মরা মাকে দেখিতে পাইয়াছিল। ব্রজেশ্বরও শুনিল।

হরবল্লভ শৌচ স্নান করিলেন, কিন্তু শ্রাদ্ধাদি নিষেধ করিলেন। বলিলেন, 'বাগদির শ্রাদ্ধ বামনে

করিবে?' নয়নতারাও স্নান করিল—মাথা মুছিয়া বলিল, 'একটা পাপ গেল—আর একটার জন্য নাওয়াটা নাইতে পারলেই শরীর জুড়ায়।'

কিছুদিন গেল। ক্রমে ক্রমে শুকাইয়া শুকাইয়া, ব্রজেশ্বর বিছানা লইল। রোগ এমন কিছু নয়, একটু একটু জ্বর হয় মাত্র, কিন্তু ব্রজ নির্জীব, শয্যাগত। বৈদ্য দেখিল। ঔষধপত্রে কিছু হইল না। রোগ বৃদ্ধি পাইল। শেষ ব্রজেশ্বর বাঁচে না-বাঁচে।

আসল কথা আর বড় লুকানো রহিল না। প্রথমে বুড়ি বুঝিয়াছিল, তার পর গিন্নি বুঝিলেন। এ সকল কথা মেয়েরাই আগে বুঝে। গিন্নি বুঝিলেই, কাজেই কর্তা বুঝিলেন। তখন হরবল্লভের বুকে শেল বিঁধিল। হরবল্লভ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, 'ছি! ছি! কী করিয়াছি! আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছি?' গিন্নি প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'ছেলে না বাঁচিলে আমি বিষ খাইব।' হরবল্লভ প্রতিজ্ঞা করিলেন, 'এবার দেবতা ব্রজেশ্বরকে বাঁচাইলে, আর আমি তার মন না বুঝিয়া কোনো কাজ করিব না।'

ব্রজেশ্বর বাঁচিল। ক্রমে আরোগ্যলাভ করিতে লাগিল—ক্রমে শয্যা ত্যাগ করিল। একদিন হরবল্লভের পিতার সাংবৎসরিক শ্রাদ্ধ উপস্থিত। হরবল্লভ শ্রাদ্ধ করিতেছেন, ব্রজেশ্বর সেখানে কোনো কার্যোপলক্ষে উপস্থিত আছেন। তিনি শুনিলেন, শ্রাদ্ধান্তে পুরোহিত মন্ত্র পড়াইলেন—

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥'

কথাটি ব্রজেশ্বর কণ্ঠস্থ করিলেন। প্রফুল্লের জন্য যখন বড় কান্না আসিত, তখন মনকে প্রবোধ দিবার জন্য বলিতেন—

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥'

এইরূপে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ভুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ব্রজেশ্বরের পিতাই যে প্রফুল্লের মৃত্যুর কারণ, সেই কথা মনে পড়িলেই ব্রজেশ্বর ভাবিতেন—

'পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্মঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।'

প্রফুল্ল গেল, কিন্তু পিতার প্রতি তবুও ব্রজেশ্বরের ভক্তি অচলা রহিল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্লের শিক্ষা আরম্ভ হইল। নিশি ঠাকুরানি, রাজার ঘরে থাকিয়া, পরে ভবানী ঠাকুরের কাছে লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন—বর্ণশিক্ষা, হস্তলিপি, কিঞ্চিৎ শুভঙ্করী আঁক প্রফুল্ল তাঁহার কাছে শিখিল। তারপর পাঠক ঠাকুর নিজে অধ্যাপকের আসন গ্রহণ করিলেন। প্রথমে ব্যাকরণ আরম্ভ করাইলেন। আরম্ভ করাইয়া দুই-চারি দিন পড়াইয়া অধ্যাপক বিস্মিত হইলেন। প্রফুল্লের বুদ্ধি অতি তীক্ষ্ণ, শিখিবার ইচ্ছা অতি প্রবল—প্রফুল্ল বড় শীঘ্র শিখিতে লাগিল। তাহার পরিশ্রমে নিশিও বিস্মিতা হইল। প্রফুল্লের রন্ধন, ভোজন, শয়ন সব নামমাত্র, কেবল 'সু ঔ জস্, অম্ ঔ শস' ইত্যাদিতে মন। নিশি বুঝিল যে, প্রফুল্ল সেই 'দুই নূতন'কে ভুলিবার জন্য অনন্যচিত্ত হইয়া বিদ্যাশিক্ষার চেষ্টা করিতেছে। ব্যাকরণ কয়েক মাসে অধিকৃত হইল। তারপর প্রফুল্ল ভট্টিকাব্য জলের মতো সাঁতার দিয়া পার হইয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অভিধান অধিকৃত হইল। রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ অবাধে অতিক্রান্ত হইল। তখন আচার্য একটু সাংখ্য, একটু বেদান্ত এবং একটু ন্যায় শিখাইলেন। এ সকল অল্প অল্প মাত্র। এই সকল দর্শনে ভূমিকা করিয়া, প্রফুল্লকে সবিস্তার যোগশাস্ত্রাধ্যয়নে নিযুক্ত করিলেন; এবং সর্বশেষে সর্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা অধীত করাইলেন। পাঁচ বৎসরে শিক্ষা সম্পূর্ণ হইল।

এদিকে প্রফুল্লের ভিন্নপ্রকার শিক্ষাও তিনি ব্যবস্থা করিতে নিযুক্ত রহিলেন। গোবরার মা কিছু কাজ করে না, কেবল হাট করে—সেটাও ভবানী ঠাকুরের ইঙ্গিতে। নিশিও বড় সাহায্য করে না, কাজেই

প্রফুল্লকে সকল কাজ করিতে হয়। তাহাতে প্রফুল্লের কষ্ট নাই—মাতার গৃহেও সকল কাজ নিজে করিতে হইত। প্রথম বৎসর তাহার আহারের জন্য ভবানী ঠাকুর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—মোটা চাউল, সৈন্ধব, ঘি ও কাঁচকলা। আর কিছুই না। নিশির জন্য তাই। প্রফুল্লের তাহাতেও কোনো কষ্ট হইল না। মার ঘরে সকল দিন এত জুটিত না। তবে প্রফুল্ল এক বিষয়ে ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। একাদশীর দিন সে জোর করিয়া মাছ খাইত—গোবরার মা হাট হইতে মাছ না আনিলে, প্রফুল্ল খানা, ডোবা, বিল, খালে আপনি ছাঁকা দিয়া মাছ ধরিত ; সুতরাং গোবরার মা হাট হইতে একাদশীতে মাছ আনিতে আর আপত্তি করিত না।

দ্বিতীয় বৎসরে নিশির আহারের ব্যবস্থা পূর্বমতো রহিল। কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে কেবল নুন লঙ্কা ভাত আর একাদশীতে মাছ। তাহাতে প্রফুল্ল কোনো আপত্তি করিল না।

তৃতীয় বৎসরে নিশির প্রতি আদেশ হইল—তুমি ছানা, সন্দেশ, ঘৃত, মাখন, ক্ষীর, ননী, ফল, মূল, অন্ন, ব্যঞ্জন উত্তমরূপে খাইবে, কিন্তু প্রফুল্লের নুন লঙ্কা ভাত। দুইজনে একত্র বসিয়া খাইবে। খাইবার সময়ে প্রফুল্ল ও নিশি দুইজনে বসিয়া হাসিত। নিশি ভালো সামগ্রী বড় খাইত না—গোবরার মাকে দিত। এই পরীক্ষাতেও প্রফুল্ল উত্তীর্ণ হইল।

চতুর্থ বৎসরে প্রফুল্লের প্রতি উপাদেয় ভোজ্য খাইতে আদেশ হইল। প্রফুল্ল তাহা খাইল।

পঞ্চম বৎসরে তাহার প্রতি যথেচ্ছ ভোজনের উপদেশ হইল। প্রফুল্ল প্রথম বৎসরের মতো খাইল।

শয়ন, বসন, স্নান, নিদ্রা সম্বন্ধে এতদনুরূপ অভ্যাসে ভবানী ঠাকুর শিষ্যাকে নিযুক্ত করিলেন। পরিধানে প্রথম বৎসরে চারিখানা কাপড়। দ্বিতীয় বৎসরে দুইখানা। তৃতীয় বৎসরে গ্রীষ্মকালে একখানা মোটা গড়া, অঙ্গে শুকাইতে হয়; শীতকালে একখানি ঢাকাই মলমল, অঙ্গে শুকাইয়া লইতে হয়। চতুর্থ বৎসরে পাট কাপড়, ঢাকাই কল্কাদার শান্তিপুরে। প্রফুল্ল সে-সকল ছিঁড়িয়া খাটো করিয়া লইয়া পরিত। পঞ্চম বৎসরে বেশ ইচ্ছামতো। প্রফুল্ল মোটা গড়াই বহাল রাখিল। মধ্যে মধ্যে ক্ষারে কাচিয়া লইত।

কেশবিন্যাস সম্বন্ধেও এইরূপ। প্রথম বৎসরে তৈল নিষেধ, চুল রুক্ষ বাঁধিতে হইত। দ্বিতীয় বৎসরে চুল বাঁধাও নিষেধ। দিনরাত্র রুক্ষ চুলের রাশি আলুলায়িত থাকিত। তৃতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুরের আদেশ অনুসারে সে মাথা মুড়াইল। চতুর্থ বৎসরে নূতন চুল হইল; ভবানী ঠাকুর আদেশ করিলেন, 'কেশ গন্ধ-তৈল দ্বারা নিষিক্ত করিয়া সর্বদা রঞ্জিত করিবে।' পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার আদেশ করিলেন। প্রফুল্ল, পঞ্চম বৎসরে চুলে হাতও দিল না।

প্রথম বৎসরে তূলার তোশকে তূলার বালিশে প্রফুল্ল শুইল। দ্বিতীয় বৎসরে বিচালির বালিশ, বিচালির বিছানা। তৃতীয় বৎসরে ভূমিশয্যা। চতুর্থ বৎসরে কোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। পঞ্চম বৎসরে প্রফুল্ল যেখানে পাইত, সেখানে শুইত।

প্রথম বৎসরে ত্রিযাম নিদ্রা। দ্বিতীয় বৎসরে দ্বিযাম। তৃতীয় বৎসরে দুই দিন অন্তর রাত্রিজাগরণ। চতুর্থ বৎসরে তন্দ্রা আসিলেই নিদ্রা। পঞ্চম বৎসরে স্বেচ্ছাচার। প্রফুল্ল রাত জাগিয়া পড়িত ও পুঁথি নকল করিত।

প্রফুল্ল জল, বাতাস, রৌদ্র, আগুন সম্বন্ধেও শরীরকে সহিষ্ণু করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের প্রতি আর একটি শিক্ষার আদেশ করিলেন, তাহা বলিতে লজ্জা করিতেছে; কিন্তু না বলিলেও কথা অসম্পূর্ণ থাকে। দ্বিতীয় বৎসরে ভবানী ঠাকুর বলিলেন, 'বাছা, একটু মল্লযুদ্ধ শিখিতে হইবে।' প্রফুল্ল লজ্জায় মুখ নত করিল, বলিল, 'ঠাকুর আর যা বলেন, তা শিখিব, এটি পারিব না।'

ভ। এটি নইলে নয়।

প্র। সে কী ঠাকুর! স্ত্রীলোক মল্লযুদ্ধ শিখিয়া কী করিবে?

ভ। ইন্দ্রিয়জয়ের জন্য। দুর্বল শরীর ইন্দ্রিয়জয় করিতে পারে না. ব্যায়াম ভিন্ন ইন্দ্রিয়জয় নাই।

প্র। কে আমাকে মল্লযুদ্ধ শিখাইবে। পুরুষমানুষের কাছে আমি মল্লযুদ্ধ শিখিতে পারিব না।

ভ। নিশি শিখাইবে। নিশি ছেলেধরার মেয়ে। তারা বলিষ্ঠ বালক-বালিকা ভিন্ন দলে রাখে না।

তাহাদের সম্প্রদায়ে থাকিয়া নিশি বাল্যকালে ব্যায়াম শিখিয়াছিল। আমি এ সকল ভাবিয়াচিন্তিয়া নিশিকে তোমার কাছে পাঠাইয়াছি।

প্রফুল্ল চারি বৎসর ধরিয়া মল্লযুদ্ধ শিখিল।

প্রথম বৎসর ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লের বাড়িতে কোনো পুরুষকে যাইতে দিতেন না বা তাহাকে বাড়ির বাহিরে কোনো পুরুষের সঙ্গে আলাপ করিতে দিতেন না। দ্বিতীয় বৎসরে আলাপ পক্ষে নিষেধ রহিত করিলেন। কিন্তু তাহার বাড়িতে কোনো পুরুষকে যাইতে দিতেন না। পরে তৃতীয় বৎসরে যখন প্রফুল্ল মাথা মুড়াইল, তখন ভবানী ঠাকুর বাছা বাছা শিষ্য সঙ্গে লইয়া প্রফুল্লের নিকট যাইতেন—প্রফুল্ল নেড়া মাথায়, অবনত মুখে তাহাদের সঙ্গে শাস্ত্রীয় আলাপ করিত। চতুর্থ বৎসরে ভবানী নিজ অনুচরদিগের মধ্যে বাছা বাছা লাঠিয়াল লইয়া আসিতেন ; প্রফুল্লকে তাহাদের সহিত মল্লযুদ্ধ করিতে বলিতেন। প্রফুল্ল তাঁহার সম্মুখে তাহাদের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ করিত। পঞ্চম বৎসরে কোনো বিধিনিষেধ রহিল না। প্রয়োজনমতো প্রফুল্ল পুরুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, নিষ্প্রয়োজনে করিত না। যখন প্রফুল্ল পুরুষমানুষদিগের সঙ্গে আলাপ করিত, তখন তাহাদিগকে আপনার পুত্র মনে করিয়া কথা কহিত।

এই মতো নানারূপ পরীক্ষা ও অভ্যাসের দ্বারা অতুল সম্পত্তির অধিকারিণী প্রফুল্লকে ভবানী ঠাকুর ঐশ্বর্যভোগের যোগ্য পাত্রী করিতে চেষ্টা করিলেন। পাঁচ বৎসরে সকল শিক্ষা শেষ হইল।

একাদশীর দিনে মাছ ছাড়া আর একটি বিষয়ে মাত্র প্রফুল্ল ভবানী ঠাকুরের অবাধ্য হইল। আপনার পরিচয় কিছু দিল না। ভবানী ঠাকুর জিজ্ঞাসাবাদ করিয়াও কিছু জানিতে পারিলেন না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পাঁচ বৎসরে অধ্যাপন সমাপ্ত করিয়া, ভবানী ঠাকুর প্রফুল্লকে বলিলেন, 'পাঁচ বৎসর হইল, তোমার শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে। আজ সমাপ্ত হইল। এখন তোমার হস্তগত ধন তোমার ইচ্ছামতো ব্যয় করিও—আমি নিষেধ করিব না। আমি পরামর্শ দিব—ইচ্ছা হয় গ্রহণ করিও। আহার আমি আর জোগাইব না–তুমি আপনি আপনার দিনপাতের উপায় করিবে। কয়টি কথা বলিয়া দিই। কথাগুলি অনেকবার বলিয়াছি—আর একবার বলি। এখন তুমি কোন্ পথ অবলম্বন করিবে ?'

প্রফুল্ল বলিল, 'কর্ম করিব, জ্ঞান আমার মতো অসিদ্ধের জন্য নহে।'

ভবানী বলিল, 'ভালো ভালো, শুনিয়া সুখী হইলাম। কিন্তু কর্ম, অসক্ত হইয়া করিতে হইবে। মনে আছে তো, ভগবান্ বলিয়াছেন—

'তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম সমাচার।
অসক্তো হ্যাচরণ্ কর্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥'

এখন অনাসক্তি কী ? তাহা জানো। ইহার প্রথম লক্ষণ, ইন্দ্রিয়-সংযম। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া তোমাকে তাহা শিখাইয়াছি, এখন আর বেশি বলিতে হইবে না। দ্বিতীয় লক্ষণ, নিরহঙ্কার। নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্মাচরণ নাই। ভগবান বলিয়াছেন—

'প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে॥'

ইন্দ্রিয়াদির দ্বারা যে-সকল কর্ম কৃত, তাহা আমি করিলাম, এই জ্ঞানই অহঙ্কার। যে কাজই কর, তোমার গুণে তাহা হইল, কখনো তাহা মনে করিবে না। করিলে পুণ্যকর্ম অকর্মত্ব প্রাপ্ত হয়। তারপর তৃতীয় লক্ষণ এই যে, সর্ব-কর্ম-ফল শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন—

'যৎ করোষি, যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্॥'

এখন বল দেখি মা, 'তোমার এই ধনরাশি লইয়া তুমি কী করিবে ?'

প্র। যখন আমার সকল কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম, তখন আমার এ ধনও শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিলাম।

ভব। সব?

প্র। সব।

ভ। ঠিক তাহা হইলে কর্ম অনাসক্ত হইবে না। আপনার আহারের জন্য যদি তোমাকে চেষ্টিত হইতে হয়, তাহা হইলে আসক্তি জন্মিবে। অতএব তোমাকে হয় ভিক্ষাবৃত্ত হইতে হইবে, নয় এই ধন হইতেই দেহ রক্ষা করিতে হইবে। ভিক্ষাতেও আসক্তি আছে। অতএব এই ধন হইতে আপনার দেহরক্ষা করিবে। আর সব শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ কর। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে এ ধন পৌঁছিবে কী প্রকারে?

প্র। শিখিয়াছি, তিনি সর্বভূতস্থিত। অতএব সর্বভূতে এ ধন বিতরণ করিব।

ভ। ভালো ভালো। ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—

'যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি॥
'সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥
'আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥'*

কিন্তু এই সর্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন। তাহা তুমি পারিবে?

প্র। এত দিন কী শিখিলাম?

ভ। সে কষ্টের কথা বলিতেছি না। কখনো কখনো কিছু দোকানদারি চাই। কিছু বেশ-বিন্যাস, কিছু ভোগ-বিলাসের ঠাট প্রয়োজন হইবে। সে বড় কষ্ট। তাহা সহিতে পারিবে?

প্র। সে কী রকম?

ভ। শোন। আমি তো ডাকাইতি করি। তাহা পূর্বেই বলিয়াছি।

প্র। আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন লইয়া ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম হইতে ক্ষান্ত হউন।

ভ। ধনে আমারো কোনো প্রয়োজন নাই। ধনও আমার যথেষ্ট আছে। আমি ধনের জন্য ডাকাইতি করি না।

`. তবে কী?

ভ। আমি রাজত্ব করি।

প্র। ডাকাইতি কীরকম রাজত্ব?

ভ। যাহার হাতে রাজদণ্ড সেই রাজা।

প্র। রাজার হাতে রাজদণ্ড।

ভ। এদেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।

প্র। ডাকাইতি করিয়া?

ভ। শুন, বুঝাইয়া দিতেছি।

ভবানী ঠাকুর বলিতে লাগিলেন, প্রফুল্ল শুনিতে লাগিল।

ভবানী, ওজস্বিনী বাক্যপরম্পরার সংযোগে দেশের দুরবস্থা বর্ণনা করিলেন, ভূম্যধিকারীর দুর্বিষহ দৌরাত্ম্য বর্ণনা করিলেন। কাছারির কর্মচারীরা, বাকিদারের ঘরবাড়ি লুঠ করে, লুকানো ধনের তল্লাশে ঘর ভাঙিয়া, মেঝে খুঁড়িয়া দেখে; পাইলে এক গুণের জায়গায় সহস্র গুণ লইয়া যায়, না পাইলে মারে,

---

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৬ অ. ৩০-৩২।

বাঁধে, কয়েদ করে, পোড়ায়, কুড়ুল মারে, ঘর জ্বালাইয়া দেয়, প্রাণবধ করে সিংহাসন হইতে শালগ্রাম ফেলিয়া দেয়, শিশুর পা ধরিয়া আছাড় মারে, যুবকের বুকে বাঁশ দিয়া দলে, বৃদ্ধের চোখের ভিতর পিঁপড়ে, নাভিতে পতঙ্গ পুরিয়া বাঁধিয়া রাখে। যুবতীকে কাছারিতে লইয়া গিয়া সর্বসমক্ষে উলঙ্গ করে, মারে, স্তন কাটিয়া ফেলে, স্ত্রীজাতির যে শেষ অপমান, চরম বিপদ, সর্বসমক্ষে তাহা প্রাপ্ত করায়। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার প্রাচীন কবির ন্যায় অত্যুন্নত শব্দচ্ছটাবিন্যাসে বিবৃত করিয়া ভবানী ঠাকুর বলিলেন, 'এই দুরাত্মাদিগের আমিই দণ্ড দিই। অনাথা দুর্বলকে রক্ষা করি। কী প্রকারে করি, তাহা তুমি দুইদিন সঙ্গে থাকিয়া দেখিবে ?'

প্রফুল্লের হৃদয় প্রজাবর্গের দুঃখের কাহিনী শুনিয়া গলিয়া গিয়াছিল। সে ভবানী ঠাকুরকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ করিল। বলিল, 'আমি সঙ্গে যাইব। ধনব্যয়ে যদি আমার এখন অধিকার হইয়াছে, তবে আমি কিছু ধন সঙ্গে লইয়া যাইব। দুঃখীদিগকে দিয়া আসিব।'

ভ। এই কাজে দোকানদারি চাই, বলিতেছিলাম। যদি আমার সঙ্গে যাও, কিছু কিছু ঠাট সাজাইতে হইবে, সন্ন্যাসিনীবেশে এ কাজ সিদ্ধ হইবে না।

প্র। কর্ম শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছি। কর্ম তাঁহার, আমার নহে। কর্মোদ্ধারের জন্য যে সুখ-দুঃখ, তাহা আমার নহে, তাঁরই। তাঁর কর্মের জন্য যাহা করিতে হয় করিব।

ভবানী ঠাকুরের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল। তিনি যখন ডাকাইতিতে সদলে বাহির হইলেন, প্রফুল্ল ধনের ঘড়া লইয়া তাঁহার সঙ্গে চলিল। নিশিও সঙ্গে গেল।

ভবানী ঠাকুরের অভিসন্ধি যাহাই হৌক, তাঁহার একখানি শাণিত অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল। তাই প্রফুল্লকে পাঁচ বৎসর ধরিয়া শাণ দিয়া, তীক্ষ্ণধার অস্ত্র করিয়া লইয়াছিলেন। পুরুষ হইলেই ভালো হইত, কিন্তু প্রফুল্লের মতো নানাগুণযুক্ত পুরুষ পাওয়া যায় নাই— বিশেষ এত ধন কোনো পুরুষের নাই। ধনের ধার বড় ধার। তবে ভবানী ঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল—প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভালো হইত। যাহা হৌক, এখন আমরা প্রফুল্লকে জীবনতরঙ্গে ভাসাইয়া দিয়া আরো পাঁচ বৎসর ঘুমাই। প্রফুল্লের অন্য শিক্ষা হইয়াছে। কর্মশিক্ষা হয় নাই। এই পাঁচ বৎসর ধরিয়া কর্মশিক্ষা হোক।

দ্বিতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

পাঁচে পাঁচে দশ বৎসর অতীত হইয়া গেল। যেদিন প্রফুল্লকে বাগদির মেয়ে বলিয়া হরবল্লভ তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেদিন হইতে দশ বৎসর হইয়া গিয়াছে। এই দশ বৎসর হরবল্লভ রায়ের পক্ষে বড় ভালো গেল না। দেশের দুর্দশার কথা আগেই বলিয়াছি। ইজারাদার দেবী সিংহের অত্যাচার, তার উপরে ডাকাইতের অত্যাচার। একবার হরবল্লভের তালুক হইতে টাকা চালান আসিতেছিল, ডাকাইতে তাহা লুঠিয়া লইল। সেবার দেবী সিংহের খাজনা দেওয়া হইল না। দেবী সিংহ একখানা তালুক বেচিয়া লইল। দেবী সিংহের বেচিয়া লওয়ার প্রথা মন্দ ছিল না। হেস্টিংস্ সাহেব ও গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কৃপায় সকল সরকারি কর্মচারী দেবী সিংহের আজ্ঞাবহ; বেচাকেনা সম্বন্ধে সে যাহা মনে করিত, তাহাই হইত। হরবল্লভের দশ হাজার টাকা মূল্যের তালুকখানা আড়াই শত টাকায় দেবী সিংহ নিজে কিনিয়া লইলেন। তাহাতে বাকি খাজনা কিছুই পরিশোধ হইল না, দেনার জের চলিল। দেবী সিংহের পীড়াপীড়িতে, কয়েদের আশঙ্কায়, হরবল্লভ আর একটি সম্পত্তি বন্ধক দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলেন। এই সকল কারণে আয় বড় কমিয়া আসিল। কিন্তু ব্যয় কিছুই কমিল না—বুনিয়াদি চাল খাটো করা যায় না। সকল লোকেরই প্রায় এমন-না-এমন এক দিন উপস্থিত হয়, যখন লক্ষ্মী আসিয়া বলেন, 'হয় সাবেক চাল ছাড়, নয় আমায় ছাড়।' অনেকেই উত্তর দেন, 'মা। তোমায় ছাড়িলাম, চাল ছাড়িতে পারি না।' হরবল্লভ তাহারই একজন। দোল-দুর্গোৎসব, ক্রিয়া-কর্ম, দান-ধ্যান, লাঠালাঠি পূর্বমতেই হইতে লাগিল—বরং ডাকাইতে চালান লুঠিয়া লওয়া অবধি লাঠিয়ালের খরচটা কিছু বাড়িয়াছিল। খরচ আর কুলায় না। কিস্তি কিস্তি সরকারি খাজনা বাকি পড়িতে লাগিল। বিষয়-আশয় যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাও বিক্রয় হইয়া যায়, আর থাকে না। দেনার উপর দেনা হইল, সুদে-আসলে ছাপাইয়া উঠিল—টাকা আর ধার পাওয়া যায় না।

এদিকে দেবী সিংহের পাওনা প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা বাকি পড়িল। হরবল্লভ কিছুতেই টাকা দিতে পারেন না—শেষ হরবল্লভ রায়কে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরওয়ানা বাহির হইল। তখনকার গ্রেপ্তারি পরওয়ানার জন্য বড় আইনকানুন খুঁজিতে হইত না, তখন ইংরেজের আইন হয় নাই। সব তখন বেআইন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় ধুম পড়িয়াছে। ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ি আসিয়াছেন। কোন্ শ্বশুরবাড়ি, তাহা বলা বাহুল্য। সাগরের বাপের বাড়ি। তখনকার দিনে একটা জামাই আসা বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। তাতে আবার ব্রজেশ্বর শ্বশুরবাড়ি সচরাচর আসে না। পুকুরে পুকুরে, মাছমহলে ভারি হুটাহুটি, ছুটাছুটি পড়িয়া গেল। জেলের দৌরাত্ম্যে প্রাণ আর রক্ষা হয় না। জেলে-মাগীদের হাঁটাহাঁটিতে পুকুরের জল কালি হইয়া যাইতে লাগিল। মাছ চুরির আশায় ছেলেরা পাঠশালা ছাড়িয়া দিল। দই, দুধ, ননী, ছানা, সর, মাখনের ফরমাইশের জ্বালায় গোয়ালার মাথা বেঠিক হইয়া উঠিল; সে কখনো এক সের জল মিশাইতে তিন সের মিশাইয়া ফেলে, তিন সের মিশাইতে এক সের মিশাইয়া বসে। কাপড়ের ব্যাপারির কাপড়ের মোট

লইয়া যাতায়াত করিতে করিতে পায়ে ব্যথা হইয়া গেল ; কাহারো পছন্দ হয় না, কোন্ ধুতি চাদর কে জামাইকে দিবে। পাড়ার মেয়েমহলে বড় হাঙ্গামা পড়িল। যাহার যাহার গহনা আছে, তারা সে-সকল সারাইতে, মাজিতে, ঘষিতে, নূতন করিয়া গাঁথাইতে লাগিল। যাহাদের গহনা নাই, তাহারা চুড়ি কিনিয়া, শাঁখা কিনিয়া, সোনা-রুপা চাহিয়া চিন্তিয়া একরকম বেশভূষার জোগাড় করিয়া রাখিল—নহিলে জামাই দেখিতে যাওয়া হয় না। যাঁহাদের রসিকতার জন্য পশার আছে, তাহারা দুই-চারিটা প্রাচীন তামাশা মনে মনে ঝালাইয়া রাখিলেন ; যাহাদের পশার নাই, তাহারা চোরাই মাল পাচার করিবার চেষ্টায় রহিলেন। কথার তামাশা পরে হবে—খাবার তামাশা আগে। তাহার জন্য ঘরে ঘরে কমিটি বসিয়া গেল। বহুতর কৃত্রিম আহার্য, পানীয় ফলমূল প্রস্তুত হইতে লাগিল। মধুর অধরগুলি মধুর হাসিতে ও সাধের মিশিতে ভরিয়া যাইতে লাগিল।

কিন্তু যার জন্য এত উদ্যোগ, তার মনে সুখ নাই। ব্রজেশ্বর আমোদ-আহ্লাদের জন্য শ্বশুরালয়ে আসেন নাই। বাপের গ্রেপ্তারির জন্য পরওয়ানা বাহির হইয়াছে—রক্ষার উপায় নাই। কেহ টাকা ধার দেয় না। শ্বশুরের টাকা আছে—শ্বশুর ধার দিলে দিতে পারে, তাই ব্রজেশ্বর শ্বশুরের কাছে আসিয়াছেন।

শ্বশুর বলিলেন, 'বাপু হে, আমার যে টাকা—সে তোমারই জন্য আছে—আমার আর কে আছে বল? কিন্তু টাকাগুলি যতদিন আমার হাতে আছে, ততদিন আছে—তোমার বাপকে দিলে কি আর থাকবে? মহাজন খাইবে। অতএব কেন আপনার ধন আপনি নষ্ট করিতে চাও?'

ব্রজেশ্বর বলিল, 'হৌক—আমি ধনের প্রত্যাশী নই—আমার বাপকে বাঁচানো আমার প্রথম কাজ।'

শ্বশুর রুক্ষভাবে বলিলেন, 'তোমার বাপ বাঁচিলে আমার মেয়ের কী? আমার মেয়ের টাকা থাকিলে দুঃখ ঘুচিবে—শ্বশুর বাঁচিলে দুঃখ ঘুচিবে না।'

কড়া কথায় ব্রজেশ্বরের বড় রাগ হইল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, 'তবে আপনার মেয়ে টাকা লইয়া থাকুক। বুঝিয়াছি, জামাইয়ে আপনার কোনো প্রয়োজন নাই। আমি জন্মের মতো বিদায় হইলাম।'

তখন সাগরের পিতা দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ব্রজেশ্বরকে বিস্তর তিরস্কার করিলেন। ব্রজেশ্বর কড়া-কড়া উত্তর দিল। কাজেই ব্রজেশ্বর তল্পিতল্পা বাঁধিতে লাগিল। শুনিয়া সাগরের মাথায় বজ্রাঘাত হইল।

সাগরের মা জামাইকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। জামাইকে অনেক বুঝাইলেন। জামাইয়ের রাগ পড়িল না। তার পর সাগরের পালা।

বধূ শ্বশুরবাড়ি আসিলে দিবসে স্বামীর সাক্ষাৎ পাওয়া যত দুরূহ ছিল, পিত্রালয়ে ততটা নয়। সাগরের সঙ্গে নিভৃতে ব্রজেশ্বরের সাক্ষাৎ হইল। সাগর ব্রজেশ্বরের পায় পড়িল, বলিল, 'আর এক দিন থাকো—আমি তো কোনো অপরাধ করি নাই?'

ব্রজেশ্বরের তখন বড় রাগ ছিল—রাগে পা টানিয়া লইলেন। রাগের সময় শারীরিক ক্রিয়াসকল বড় জোরে জোরে হয়, আর হাত-পায়ের গতিও ঠিক অভিমতরূপ হয় না। একটা করিতে বিকৃতি জন্য আর একটা হইয়া পড়ে। সেই কারণে, আর কতকটা সাগরের ব্যস্ততার কারণ, পা সরাইয়া লইতে প্রমাদ ঘটিল। পা একটু জোরে সাগরের গায়ে লাগিল। সাগর মনে করিল, স্বামী রাগ করিয়া আমাকে লাথি মারিলেন। সাগর স্বামীর পা ছাড়িয়া দিয়া কুপিত ফণিনীর ন্যায় দাঁড়াইয়া উঠিল—'কী! আমায় লাথি মারিলে?'

বাস্তবিক ব্রজেশ্বরের লাথি মারিবার ইচ্ছা ছিল না—তাই বলিলেই মিটিয়া যাইত। কিন্তু একে রাগের সময়, আবার সাগর চোখমুখ ঘুরাইয়া দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বরের রাগ বাড়িয়া গেল। বলিলেন, 'যদি মারিয়াই থাকি? তুমি নাহয় বড়মানুষের মেয়ে, কিন্তু পা আমার—তোমার বড়মানুষ বাপও এ-পা একদিন পূজা করিয়াছিলেন।'

সাগর রাগে জ্ঞান হারাইল। বলিল, 'ঝকমারি করিয়াছিলেন। আমি তার প্রায়শ্চিত্ত করিব।'

ব্র। পালটে লাথি মারবে নাকি?

সা। আমি তত অধম নহি। কিন্তু আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা—

সাগরের কথা ফুরাইতে–না–ফুরাইতে পিছনের জানলা হইতে কে বলিল, 'আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মতো টিপিয়া দিবে।'

সাগরের মুখে সেইরকম কী কথা আসিতেছিল। সাগর না ভাবিয়া–চিন্তিয়া, পিছন ফিরিয়া না–দেখিয়া রাগের মাথায় সেই কথাই বলিল, 'আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মতো টিপিয়া দিবে।'

ব্রজেশ্বরও রাগে সপ্তমে চড়িয়া কোনোদিকে না চাহিয়া বলিল, 'আমারও সেই কথা। যতদিন আমি তোমার পা টিপিয়া না দিই, ততদিন আমিও তোমার মুখ দেখিব না। যদি আমার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, তবে আমি অব্রাহ্মণ।'

তখন রাগে রাগে তিনটা হইয়া ফুলিয়া ব্রজেশ্বর চলিয়া গেল। সাগর পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসিল। এমন সময়ে সাগর যে–ঘরে বসিয়া কাঁদিতেছিল, সেই ঘরে একজন পরিচারিকা, ব্রজেশ্বর গেলে পর সাগরের কী অবস্থা হইয়াছে, ইহা দেখিবার অভিপ্রায়ে ভিতরে প্রবেশ করিল, ছুতানাতা করিয়া দুই–একটা কাজ করিতে লাগিল। তখন সাগরের মনে পড়ল যে, জানলা হইতে কে কথা কহিয়াছিল। সাগর তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুই জানলা হইতে কথা কহিয়াছিলি?'

সে বলিল, 'কই না?'

সাগর বলিল, 'তবে কে জানেলায় দেখ্ তো।'

তখন সাক্ষাৎ ভগবতীর মতো রূপবতী ও তেজস্বিনী একজন স্ত্রীলোক ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। সে বলিল, 'জানালায় আমি ছিলাম।'

সাগর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে গা?'

তখন সে স্ত্রীলোক বলিল, 'তোমরা কি কেউ আমায় চেনো না?'

সাগর বলিল, 'না—কে তুমি?' তখন সেই স্ত্রীলোক উত্তর করিল, 'আমি দেবী চৌধুরানি।'

পরিচারিকার হাতে পানের বাটা ছিল, ঝনঝন করিয়া পড়িয়া গেল। সেও কাঁপিতে কাঁপিতে আঁ—আঁ—আঁ—আঁ শব্দ করিতে করিতে বসিয়া পড়িল। কাঁকালের কাপড় খসিয়া পড়িল।

দেবী চৌধুরানি তাহার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'চুপ রহো, হারামজাদি! খাড়া রহো।'

পরিচারিকা কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। সাগরেরও গায়ে ঘাম দিতেছিল। সাগরের মুখেও কথা ফুটিল না। যে নাম তাহাদের কানে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা ছেলে–বুড়ো কে না শুনিয়াছিল? সে নাম অতি ভয়ানক।

কিন্তু সাগর আবার ক্ষণেক পরে হাসিয়া উঠিল। তখন দেবী চৌধুরানিও হাসিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

বর্ষাকাল। রাত্রি জোছনা। জোছনা এমন বড় উজ্জ্বল নয়, বড় মধুর, একটু অন্ধকারমাখা —পৃথিবীর স্বপ্নময় আবরণের মতো। ত্রিস্রোতা নদী বর্ষাকালের জলপ্লাবনে কূলে কূলে পরিপূর্ণ। চন্দ্রের কিরণ সেই তীব্রগতি নদীজলের স্রোতের উপর—স্রোতে, আবর্তে কদাচিৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গে জ্বলিতেছে। কোথাও জল একটু ফুটিয়া উঠিতেছে—সেখানে একটু চিকিমিকি ; কোথাও চরে ঠেকিয়া ক্ষুদ্র বীচিভঙ্গ হইতেছে, সেখানে একটু ঝিকিমিকি। তীরে, গাছের গোড়ায় জল আসিয়া লাগিয়াছে—গাছের ছায়া পড়িয়া সেখানে জল বড় অন্ধকার ; অন্ধকারে গাছের ফুল, ফল, পাতা বাহিয়া তীব্র স্রোত চলিতেছে ; তীরে ঠেকিয়া জল একটু তরতর কলকল পতপত শব্দ করিতেছে—কিন্তু সে আঁধারে আঁধারে। সে বিশাল জলধারা সমুদ্রানুসন্ধানে পক্ষিণীর বেগে ছুটিয়াছে। কূলে কূলে অসংখ্য কলকল শব্দ, আবর্তের ঘোর গর্জন, প্রতিহত স্রোতের তেমনি গর্জন ; সর্বসুদ্ধ একটা গম্ভীর গগনব্যাপী শব্দ উঠিতেছে।

সেই ত্রিস্রোতার উপরে, কূলের অনতিদূরে একখানি বজরা বাঁধা আছে। বজরার অনতিদূরে একটা বড় তেঁতুলগাছের ছায়ায়, অন্ধকারে আর একখানি নৌকা আছে—তাহার কথা পরে বলিব, আগে

বজরার কথা বলি। বজরাখানি নানবর্ণে চিত্রিত ; তাহাতে কত রকম মুরদ আঁকা আছে। তাহার পিতলের হাতল ডাণ্ডা প্রভৃতিতে রুপোর গিল্টি গলুইয়ে একটা হাঙ্গরের মুখ—সেটাও গিল্টি করা। সর্বত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, উজ্জ্বল, আবার নিস্তব্ধ। নাবিকেরা একপাশে বাঁশের উপর পাল ঢাকা দিয়া শুইয়া আছে ; কেহ জাগিয়া থাকার চিহ্ন নাই। কেবল বজরার ছাদের উপর—একজন মানুষ। অপূর্ব দৃশ্য !

ছাদের উপর একখানি ছোট গালিচা পাতা। গালিচাখানি দুই আঙুল পুরু—বড় কোমল, নানাবিধ চিত্রে চিত্রিত। গালিচার উপর বসিয়া একজন স্ত্রীলোক। তাহার বয়স অনুমান করা ভার—পঁচিশ বৎসরের নিচে তেমন পূর্ণায়ত দেহ দেখা যায় না ; পঁচিশ বৎসরের উপর তেমন যৌবনের লাবণ্য কোথাও পাওয়া যায় না। বয়স যাই হউক—সে স্ত্রীলোক পরম সুন্দরী, সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। এ সুন্দরী কৃশাঙ্গী নহে অথচ স্থূলাঙ্গী বলিলেই ইহার নিন্দা হইবে। বস্তুত ইহার অবয়ব সর্বত্র ষোলোকলা সম্পূর্ণ—আজি ত্রিস্রোতা যেমন কূলে কূলে পুরিয়াছে, ইহারও শরীর তেমনই কূলে কূলে পুরিয়াছে। তার উপর বিলক্ষণ উন্নত দেহ। দেহ তেমন উন্নত বলিয়াই স্থূলাঙ্গী বলিতে পারিলাম না। যৌবন-বর্ষার চারি পোয়া বন্যার জল, সে কমনীয় আধারে ধরিয়াছে—ছাপায় নাই। কিন্তু জল কূলে কূলে পুরিয়া টলটল করিতেছে—অস্থির হইয়াছে। জল অস্থির, কিন্তু নদী অস্থির নহে ; নিস্তরঙ্গ। লাবণ্য চঞ্চল, কিন্তু সে লাবণ্যময়ী চঞ্চলা নহে—নির্বিকার। সে শান্ত, গম্ভীর, মধুর অথচ আনন্দময়ী ; সেই জোছনাময়ী নদীর অনুষঙ্গিনী। সেই নদীর মতো, সেই সুন্দরীও বড় সুসজ্জিতা। এখন ঢাকাই কাপড়ের তত মর্যাদা নাই—কিন্তু একশত বৎসর আগে কাপড়ও ভালো হইত, উপযুক্ত মর্যাদাও ছিল। ইহার পরিধানে একখানি পরিষ্কার মিহি ঢাকাই, তাতে জরির ফুল। তাহার ভিতর হীরামুক্তাখচিত কাঁচুলি ঝকমক করিতেছে। হীরা, পান্না, মোতি, সোনায় সেই পরিপূর্ণ দেহ মণ্ডিত ; জোছনা আলোকে বড় ঝকমক করিতেছে। নদীর জলে যেমন চিকিমিকি—এই শরীরেও তাই। জোছনার পুলকিত স্থির নদীজলের মতো—সেই শুভ্র বসন ; আর জলে মাঝে মাঝে যেমন জোছনার চিকিমিকি চিকিমিকি—শুভ্র বসনের মাঝে মাঝে তেমনি হীরা, মুক্তা, মোতির চিকিমিকি। আবার নদীর যেমন তীরবর্তী বনচ্ছায়া, ইহারও তেমনি অন্ধকার কেশরাশি আলুলায়িত হইয়া অঙ্গের উপর পড়িয়াছে। কোঁকড়াইয়া, ঘুরিয়া ঘুরিয়া, ফিরিয়া ফিরিয়া, গোছায় গোছায় কেশপৃষ্ঠে, অংসে, বাহুতে, বক্ষে পড়িয়াছে ; তার মসৃণ কোমল প্রভার উপর চাঁদের আলো খেলা করিতেছে ; তাহার সুগন্ধি-পূর্ণ-গন্ধে গগন পরিপূরিত হইয়াছে। এক ছড়া জুঁইফুলের গড়ে সেই কেশরাশি সংবেষ্টন করিতেছে।

ছাদের উপর গালিচা পাতিয়া, সেই বহুরত্নমণ্ডিতা রূপবতী মূর্তিমতী সরস্বতীর ন্যায় বীণাবাদনে নিযুক্তা। চন্দ্রের আলোয় জোছনার মতো বর্ণ মিশিয়াছে ; তাহার সঙ্গে সেই মৃদুমধুর বীণার ধ্বনিও মিশিতেছে—যেমন জলে জলে চন্দ্রের কিরণ খেলিতেছে, যেমন এ সুন্দরীর অলঙ্কারে চাঁদের আলো খেলিতেছে, এ বন্যকুসুম-সুগন্ধি কৌমুদীস্নাত বায়ুস্তরসকলে সেই বীণার শব্দ তেমনি খেলিতেছিল। ঝম ঝম ছন ছন ঝনন ঝনন ছনন ছনন দম দম দ্রিম দ্রিম বলিয়া বীণে কত কী বাজিতেছিল, তাহা আমি বলিতে পারি না। বীণা কখনো কাঁদে, কখনো রাগিয়া উঠে ; কখনো নাচে, কখনো আদর করে, কখনো গর্জিয়া উঠে—বাজিয়ে টিপি টিপি হাসে। ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সিন্ধু—কত মিঠে রাগিণী বাজিল; কেদার, হাম্বীর, বেহাগ—কত গম্ভীর রাগিণী বাজিল; কানাড়া, শাহানা, বাগীশ্বরী—কত জাঁকালো রাগিণী বাজিল; নদ, কুসুমের মালার মতো নদীকল্লোল-স্রোতে ভাসিয়া গেল। তারপর দুই-একটা পরদা উঠাইয়া নামাইয়া লইয়া, সহসা নূতন উৎসাহে উন্মুখী হইয়া সে বিদ্যাবতী ঝনঝন করিয়া বীণের তারে বড় বড় ঘা দিল। কানের পিপুলপাত দুলিয়া উঠিল—মাথায় সাপের মতো চুলের গোছা সব নড়িয়া উঠিল—বীণে নটরাগিণী বাজিতে লাগিল। তখন যাহারা পাল মুড়ি দিয়া একপ্রান্তে নিঃশব্দে নিদ্রিতবৎ শুইয়াছিল, তাহার মধ্যে একজন উঠিয়া আসিয়া নিঃশব্দে সুন্দরীর নিকটে দাঁড়াইল।

এ ব্যক্তি পুরুষ। সে দীর্ঘকায় ও বলিষ্ঠগঠন ; ভারী রকমের একজোড়া চৌগোঁপ্পা আছে। গলায় যজ্ঞোপবীত। সে নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কী হইয়াছে?'

সেই স্ত্রীলোক বলিল, 'দেখিতে পাইতেছ না?'

পুরুষ বলিল, 'কিছু না। আসিতেছে কী?'

গালিচার উপর একটা ছোট দূরবীন পড়িয়াছিল। দূরবীন তখন ভারতবর্ষে নূতন আমদানি হইতেছিল। দূরবীন লইয়া সুন্দরী ঐ ব্যক্তির হাতে দিল—কিছু বলিল না। সে দূরবীন চক্ষে দিয়া নদীর সকল দিক নিরীক্ষণ করিল। শেষ এক স্থানে আর-একখানি বজরা দেখিতে পাইয়া বলিল, 'দেখিয়াছি—টেঁকের মাথায়—ঐ কী?'

উ। এ নদীতে আজকাল আর কোনো বজরা আসিবার কথা নাই।

পুরুষ পুনর্বার দূরবীন দিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

যুবতী বীণা বাজাইতে বাজাইতে বলিল, 'রঙ্গরাজ!'

রঙ্গরাজ উত্তর করিল,'আজ্ঞা?'

'দেখ কী?'

'কয় জন লোক আছে তাই দেখি।'

'কয় জন?'

'ঠিক ঠাওর পাই না। বেশি নয়। খুলিব?'

'খোলো ছিপ। আঁধারে আঁধারে নিঃশব্দে উজাইয়া যাও।' তখন রঙ্গরাজ ডাকিয়া বলিল, 'ছিপ খোলো।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পূর্বে বলিয়াছি, বজরার কাছে তেঁতুলগাছের ছায়ায় আর-একখানি নৌকা অন্ধকারে লুকাইয়াছিল। সেখানি ছিপ—ষাট হাত লম্বা, তিন হাতের বেশি চৌড়া নয়। তাহাতে প্রায় পঞ্চাশজন লোক গাদাগাদি হইয়া শুইয়াছিল। রঙ্গরাজের সঙ্কেত শুনিবামাত্র সেই পঞ্চাশজন একেবারে উঠিয়া বসিল। বাঁশের চেলা তুলিয়া সকলেই এক-একগোছা সড়কি ও এক-একখানা ছোট ঢাল বাহির করিল। হাতিয়ার কেহ হাতে রাখিল না—সবাই আপনার নিকট চেলার উপর সাজাইয়া রাখিল। রাখিয়াই সকলে এক-একখানা 'বোটে' হাতে করিয়া বসিল।

নিঃশব্দে ছিপ খুলিয়া, তাহারা বজরায় আসিয়া লাগাইল। রঙ্গরাজ তখন নিজে পঞ্চ হাতিয়ার বাঁধিয়া উহার উপর উঠিল। সেই সময়ে যুবতী তাহাকে ডাকিয়া বলিল, 'রঙ্গরাজ, আগে যাহা বলিয়া দিয়াছি, মনে থাকে যেন।'

'মনে আছে' বলিয়া রঙ্গরাজ ছিপে উঠিল। ছিপ নিঃশব্দে তীরে তীরে উজাইয়া চলিল। এদিকে যে বজরা রঙ্গরাজ দূরবীনে দেখিয়াছিল, তাহা নদী বাহিয়া খরস্রোতে তীব্রবেগে আসিতেছিল। ছিপকে বড় বেশি উজাইতে হইল না। বজরা নিকট হইলে, ছিপ তীর ছাড়িয়া বজরার দিকে ধাবমান হইল। পঞ্চাশখানা বোটে, কিন্তু শব্দ নাই।

এখন, সেই বজরার ছাদের উপরে আটজন হিন্দুস্থানি রক্ষক ছিল। এত লোক সঙ্গে না করিয়া তখনকার দিনে কেহ রাত্রিকালে নৌকা খুলিতে সাহস করিত না। আটজনের মধ্যে, দুইজন হাতিয়ারবন্ধ হইয়া, মাথায় লাল পাগড়ি বাঁধিয়া ছাদের উপর বসিয়াছিল—আর ছয়জন মধুর দক্ষিণ বাতাসে চাঁদের আলোতে কালো দাড়ি ছড়াইয়া, সুনিদ্রায় অভিভূত ছিল। যাহারা পাহারায় ছিল, তাহাদের মধ্যে একজন দেখিল—ছিপ বজরার দিকে আসিতেছে। সে দস্তুরমতো হাঁকিল, 'ছিপ তফাত!'

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, 'তোর দরকার হয়, তুই তফাত যা।'

প্রহরী দেখিল, বেগোছ। ভয় দেখাইবার জন্য বন্দুকে একটা ফাঁকা আওয়াজ করিল। রঙ্গরাজ বুঝিল, ফাঁকা আওয়াজ। হাসিয়া বলিল, 'কী পাঁড়ে ঠাকুর! একটা ছররাও নাই? ধার দিব?'

এই বলিয়া রঙ্গরাজ সেই প্রহরীর মাথা লক্ষ্য করিয়া বন্দুক উঠাইল। তারপর বন্দুক নামাইয়া বলিল,

'তোমায় এবার মারিব না। এবার তোমার লাল পাগড়ি উড়াইব।' এই কথা বলিতে বলিতে রঙ্গরাজ বন্দুক রাখিয়া, তীর ধনু লইয়া সজোরে তীর ত্যাগ করিল। প্রহরীর মাথার লাল পাগড়ি উড়িয়া গেল। প্রহরী 'রাম রাম!' শব্দ করিতে লাগিল।

বলিতে বলিতে ছিপ আসিয়া বজরার পিছনে লাগিল। অমনি দশ-বারোজন লোক ছিপ হইতে হাতিয়ার-সমেত বজরার উপর উঠিয়া পড়িল। যে ছয়জন হিন্দুস্থানি নিদ্রিত ছিল, তাহারা বন্দুকের আওয়াজে জাগ্রত হইয়াছিল বটে, কিন্তু ঘুমের ঘোরে হাতিয়ার হাতড়াইতে তাহাদের দিন গেল। ক্ষিপ্রহস্তে আক্রমণকারীরা তাহাদিগকে নিমেষমধ্যে বাঁধিয়া ফেলিল। যে দুইজন আগে হইতে জাগ্রত ছিল তাহারা লড়াই করিল, কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র। আক্রমণকারীরা সংখ্যায় অধিক, শীঘ্র তাহাদিগকে পরাস্ত ও নিরস্ত্র করিয়া বাঁধিয়া ফেলিল। তখন ছিপের লোক বজরার ভিতর প্রবেশ করিতে উদ্যত হইল। বজরার দ্বার বন্ধ।

ভিতরে ব্রজেশ্বর। তিনি শ্বশুরবাড়ি হইতে বাড়ি যাইতেছিলেন। পথে এই বিপদ। এ কেবল তাহার সাহসের ফল। অন্য কেহ সাহস করিয়া রাত্রে বজরা খুলিত না।

রঙ্গরাজ কপাটে করাঘাত করিয়া বলিল, 'মহাশয়! দ্বার খুলুন!'

ভিতর হইতে সদ্যোনিদ্রোত্থিত ব্রজেশ্বর উত্তর করিল, 'কে? এত গোল কিসের?'

রঙ্গরাজ বলিল, 'গোল কিছুই না—বজরায় ডাকাইত পড়িয়াছে।'

ব্রজেশ্বর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া পরে ডাকিতে লাগিল, 'পাঁড়ে! তেওয়ারি! রামসিং?'

রামসিং ছাদের উপর হইতে বলিল, 'ধর্মাবতার! শালা লোক সব কোইকো বাঁধকে রাক্‌খা।'

ব্রজেশ্বর ঈষৎ হাসিয়া বলিল, 'শুনিয়া বড় দুঃখিত হইলাম। তোমাদের মতো বীরপুরুষদের ডালরুটি খাইতে না দিয়া বাঁধিয়া ফেলিয়াছে! ডাকাইতের এ বড় ভ্রম। ভাবনা করিও না—কাল ডালরুটির বরাদ্দ বাড়াইয়া দিব।'

শুনিয়া রঙ্গরাজ ঈষৎ হাসিল। বলিল, 'আমারও সেই মত; এখন দ্বার খুলিবেন বোধহয়।'

ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে?'

রঙ্গরাজ। আমি একজন ডাকাইত মাত্র। দ্বার খোলেন এই ভিক্ষা।

'কেন দ্বার খুলিব?'

রঙ্গরাজ। আপনার সর্বস্ব লুটপাট করিব।

ব্রজেশ্বর বলিল, 'কেন? আমাকে কি হিন্দুস্থানি ভেড়িওয়ালা পাইলে? আমার হাতে দোনালা বন্দুক আছে—তৈয়ার, যে প্রথম কামরায় প্রবেশ করিবে, নিশ্চয় তাহার প্রাণ লইব।'

রঙ্গরাজ। একজন প্রবেশ করিব না—কয় জনকে মারিবেন? আপনিও ব্রাহ্মণ—আমিও ব্রাহ্মণ। এক তরফ ব্রহ্মহত্যা হইবে। মিছামিছি ব্রহ্মহত্যায় কাজ কী?

ব্রজেশ্বর বলিল, 'সে পাপটা নাহয় আমিই স্বীকার করিব।'

এই কথা ফুরাইতে-না-ফুরাইতে মড়মড় শব্দ হইল। বজরার পাশের দিকের একখানা কপাট ভাঙিয়া, একজন ডাকাইত কামরার ভিতর প্রবেশ করিল দেখিয়া, ব্রজেশ্বর হাতের বন্দুক ফিরাইয়া তাহার মাথায় মারিল। দস্যু মূর্ছিত হইয়া পড়িল। এই সময়ে রঙ্গরাজ বাহিরের কপাটে জোরে দুইবার পদাঘাত করিল। কপাট ভাঙিয়া গেল। রঙ্গরাজ কামরার ভিতর প্রবেশ করিল। ব্রজেশ্বর আবার বন্দুক ফিরাইয়া ধরিয়া, রঙ্গরাজকে লক্ষ্য করিতেছিলেন, এমন সময়ে রঙ্গরাজ তাঁহার হাত হইতে বন্দুক কাড়িয়া লইল। দুইজনেই তুল্য বলশালী, তবে রঙ্গরাজ অধিকতর ক্ষিপ্রহস্ত। ব্রজেশ্বর ভালো করিয়া ধরিতে-না-ধরিতে, রঙ্গরাজ বন্দুক কাড়িয়া লইল। ব্রজেশ্বর তখন দৃঢ়তর মুষ্টিবদ্ধ করিয়া সমুদয় বলের সহিত রঙ্গরাজের মাথায় ঘুসি তুলিল। রঙ্গরাজ ঘুসিটা হাতে ধরিয়া ফেলিল। বজরার একদিকে অনেক অস্ত্র ঝুলানো ছিল। এই সময়ে ব্রজেশ্বর ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মধ্য হইতে একখানা তীক্ষ্ণধার তরবারি লইয়া হাসিয়া বলিল, 'দেখ ঠাকুর, ব্রহ্মহত্যায় আমার ভয় নাই।' এই বলিয়া রঙ্গরাজকে কাটিতে ব্রজেশ্বর তরবারি উঠাইল। সেই সময়ে আর চারি-পাঁচজন দস্যু মুক্তদ্বারে কামরার ভিতর

প্রবেশ করিয়া, তাহার উপর পড়িল উত্থিত তরবারি হাত হইতে কাড়িয়া লইল দুইজনে দুই হাত চাপিয়া ধরিল—একজন দড়ি লইয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, 'বাঁধিতে হইবে কি?' তখন ব্রজেশ্বর বলিল, 'বাঁধিও না আমি পরাজয় স্বীকার করিলাম। কী চাও বল—আমি দিতেছি।'

রঙ্গরাজ বলিল, 'আপনার যাহা কিছু আছে সব লইয়া যাইব। কিছু ছাড়িয়া দিতে পারিতাম; কিন্তু যে কিল তুলিয়াছিলেন, আমার মাথায় লাগিলে মাথা ভাঙিয়া যাইত—এক পয়সাও ছাড়িব না।'

ব্রজেশ্বর বলিল, 'যাহা বজরায় আছে—সব লইয়া যাও, এখন আর আপত্তি করিব না।'

ব্রজেশ্বর এ-কথা বলিবার পূর্বেই দস্যুরা জিনিসপত্র বজরা হইতে ছিপে তুলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। এখন প্রায় পঁচিশজন লোক বজরায় উঠিয়াছিল। জিনিসপত্র বজরায় বিশেষ কিছু ছিল না; কেবল পরিধেয় বস্ত্রাদি, পূজার সামগ্রী, এইরূপ মাত্র। মুহূর্তমধ্যে তাহারা সেই সকল দ্রব্য ছিপে তুলিয়া ফেলিল। তখন আরোহী রঙ্গরাজকে বলিল, 'সব জিনিস লইয়াছ—আর কেন দিক্ কর, এখন স্বস্থানে যাও।'

রঙ্গরাজ উত্তর করিল, 'যাইতেছি। কিন্তু আপনাকেও আমাদের সঙ্গে যাইতে হইবে।'

ব্র। সে কী! আমি কোথায় যাইব?

রঙ্গ। আমাদের রানির কাছে।

ব্র। তোমাদের আবার রানি কে?

রঙ্গ। আমাদের রাজরানি।

ব্র। তিনি আবার কে? ডাকাইতের রাজরানি তো কখনো শুনি নাই।

রঙ্গ। দেবী রানির নাম কখনো শুনেন নাই?

ব্র। ও হো! তোমরা দেবী চৌধুরানির দল?

রঙ্গ। দলাদলি আবার কী? আমরা রানিজির কারপরদাজ।

ব্র। যেমন রানি, তেমন কারপরদাজ! তা, আমাকে রানিদর্শনে যাইতে হইবে কেন? আমাকে কয়েদ রাখিয়া কিছু আদায় করিবে, এই অভিপ্রায়ে?

রঙ্গ। কাজেই। বজরায় তো কিছু পাইলাম না। আপনাকে আটক করিলে যদি কিছু পাওয়া যায়।

ব্র। আমারও যাইবার ইচ্ছা হইতেছে—তোমাদের রাজরানি একটা দেখবার জিনিস শুনিয়াছি। তিনি নাকি যুবতী?

রঙ্গ। তিনি আমাদের মা—সন্তানে মা'র বয়সের হিসাব রাখে না।

ব্র। শুনিয়াছি বড় রূপবতী।

রঙ্গ। আমাদের মা ভগবতীর তুল্য।

ব্র। চল, তবে ভগবতী-দর্শনে যাই।

এই বলিয়া, ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার বাহিরে আসিলেন। দেখিলেন যে, বজরার মাঝিমাল্লা সকলে ভয়ে জলে পড়িয়া কাছি ধরিয়া ভাসিয়া আছে। ব্রজেশ্বর তাহাদিগকে বলিলেন, 'এখন তোমরা বজরায় উঠিতে পার—ভয় নাই। উঠিয়া আল্লার নাম নাও। তোমাদের জান ও মান ও দৌলত ও ইজ্জৎ সব বজায় আছে! তোমরা বড় হুঁশিয়ার!'

মাঝিরা তখন একে একে বজরায় উঠিতে লাগিল। ব্রজেশ্বর রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এখন আমার দ্বারবান্দের বাঁধন খুলিয়া দিতে পারি কি?'

রঙ্গরাজ বলিল, 'আপত্তি নাই। উহারা যদি হাত খোলা পাইয়া আমাদের উপর আক্রমণ করে, তখনই আমরা আপনার মাথা কাটিয়া ফেলিব। ইহা উহাদের বুঝাইয়া দিন।'

ব্রজেশ্বর দ্বারবানদিগকে সেইরূপ বুঝাইয়া দিলেন। আর ভরসা দিলেন যে, তাহারা যেরূপ বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছে, তাহাতে শীঘ্রই তাহাদের ভালরুটির বরাদ্দ বাড়িবে। তখন ব্রজেশ্বর ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন যে, 'তোমরা নিঃশঙ্কচিত্তে এইখানে বজরা লইয়া থাকো। কোথাও যাইও না বা কিছু করিও না। আমি শীঘ্রই ফিরিয়া আসিতেছি।' এই বলিয়া তিনি রঙ্গরাজের সঙ্গে ছিপে উঠিলেন। ছিপের নাবিকেরা 'দেবী রানি-কি জয়? হাঁকিল—ছিপ বাহিয়া চলিল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর যাইতে যাইতে রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আমাকে কত দূর লইয়া যাইবে—তোমার রানিজি কোথায় থাকেন?'

রঙ্গ। ঐ বজরা দেখিতেছ না? ঐ বজরা তাঁর।

ব্রজ। ও বজরা? আমি মনে করিয়াছিলাম, ওখানা ইংরেজের জাহাজ—রঙ্গপুর লুটিতে আসিয়াছে। তা অতবড় বজরা কেন?

রঙ্গ। রানিকে রানির মতো থাকিতে হয়। উহাতে সাতটা কামরা আছে।

ব্র। এত কামরায় কে থাকে?

রঙ্গ। একটায় দরবার। একটায় রানির শয়নঘর। একটায় চাকরানিরা থাকে। একটায় স্নান হয়। একটায় পাক হয়। একটা ফাটক। বোধহয় আপনাকে আজ সেই কামরায় থাকিতে হইবে।

এ কথোপকথন হইতে হইতে ছিপ আসিয়া বজরার পাশে ভিড়িল। দেবী রানি ওরফে দেবী চৌধুরানি তখন আর ছাদের উপর নাই। যতক্ষণ তাহার লোকে ডাকাইতি করিতেছিল, দেবী ততক্ষণ ছাদের উপর বসিয়া জোছনালোকে বীণা বাজাইতেছিল। তখন বাজনাটা বড় ভালো হইতেছিল না—বেসুর, বেতাল, কী বাজিতে কী বাজে—দেবী অন্যমনা হইতেছিল। তার পরে যেই ছিপ ফিরিল, দেবী অমনি নামিয়া কামরার ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিল। এদিকে রঙ্গরাজ ছিপ হইতে কামরার দ্বারে আসিয়া দাঁড়াইয়া, 'রানিজি-কি জয়' বলিল। দ্বারে রেশমি পরদা ফেলা আছে—ভিতর দেখা যায় না। ভিতর হইতে দেবী জিজ্ঞাসা করিল, 'কী সংবাদ?'

রঙ্গ। সব মঙ্গল।

দেবী। তোমাদের কেহ জখম হইয়াছে?

রঙ্গ। কেহ না।

দেবী। তাহাদের কেহ খুন হইয়াছে?

রঙ্গ। কেহ না—আপনার আজ্ঞামতো কাজ হইয়াছে।

দেবী। তাহাদের কেহ জখম হইয়াছে?

রঙ্গ। দুইটা হিন্দুস্থানি দুই-একটা আঁচড় খেয়েছে। কাঁটা ফোঁটার মতো।

দেবী। মাল?

রঙ্গ। সব আনিয়াছি। মাল এমন কিছু ছিল না।

দেবী। বাবু?

রঙ্গ। বাবুকে ধরিয়া আনিয়াছি।

দেবী। হাজির কর।

রঙ্গরাজ তখন ব্রজেশ্বরকে ইঙ্গিত করিল। ব্রজেশ্বর ছিপ হইতে উঠিয়া আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইল। দেবী জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কে?' দেবীর যেন বিষম লাগিয়াছে—গলার আওয়াজটা বড় সাফ নয়।

ব্রজেশ্বর যেরূপ লোক, পাঠক এতক্ষণে বুঝিয়াছেন বোধহয়। ভয় কাহাকে বলে, তাহা তিনি বাল্যকাল হইতে জানেন না। যে দেবী চৌধুরানির নামে উত্তর-বাঙ্গালা কাঁপিত, তাহার কাছে আসিয়া ব্রজেশ্বরের হাসি পাইল। মনে ভাবিলেন, 'মেয়েমানুষকে পুরুষে ভয় করে, এ তো কখনো শুনি নাই। মেয়েমানুষ তো পুরুষের বাঁদী।' হাসিয়া ব্রজেশ্বর দেবীর কথায় উত্তর দিলেন, 'পরিচয় লইয়া কী হইবে? আমার ধনের সঙ্গে আপনাদিগের সম্বন্ধ, তাহা পাইয়াছেন —নামে তো টাকা হইবে না।'

দেবী। হইবে বৈকি? আপনি কী দরের লোক, তাহা জানিলে টাকার ঠিকানা হইবে। (তবু গলাটা ধরা-ধরা)।

ব্রজ। সেইজন্যই কি আমাকে ধরিয়া আনিয়াছেন?

দেবী। নহিলে আপনাকে আমরা আনিতাম না।

দেবী পরদার আড়ালে ; কেহ দেখিল না যে, দেবী এই কথা বলিবার সময় চোখ মুছিল।

ব্রজ। আমি যদি বলি, আমার নাম দুঃখীরাম চক্রবর্তী, আপনি বিশ্বাস করিবেন কি?
দেবী। না।
ব্রজ। তবে জিজ্ঞাসার প্রয়োজন কী?
দেবী। আপনি বলেন কি না, দেখিবার জন্য।
ব্রজ। আমার নাম কৃষ্ণগোবিন্দ ঘোষাল।
দেবী। না।
ব্রজ। দয়ারাম বক্সী।
দেবী। তাও না।
ব্রজ। ব্রজেশ্বর রায়।
দেবী। হইতে পারে।

এই সময়ে দেবীর কাছে আর-একজন স্ত্রীলোক নিঃশব্দে আসিয়া বসিল। বলিল, 'গলাটা ধ'রে গেছে যে?'

দেবীর চক্ষের জল আর থাকিল না—বর্ষাকালের ফুটন্ত ফুলের ভিতর যেমন বৃষ্টির জল পোরা থাকে, ডাল নাড়া দিলেই জল হুড়হুড় করিয়া পড়িয়া যায়, দেবীর চোখে তেমনি জল পোরা ছিল, ডাল নাড়া দিতেই ঝরঝর করিয়া পড়িয়া গেল। দেবী তখন ঐ স্ত্রীলোককে কানে কানে বলিল, 'আমি আর এ রঙ্গ করিতে পারি না। তুই কথা 'ক'। সব জানিস তো?'

এই বলিয়া দেবী সে কামরা হইতে উঠিয়া অন্য কামরায় গেল। ঐ স্ত্রীলোকটি দেবীর আসন গ্রহণ করিয়া, ব্রজেশ্বরের সহিত কথা কহিতে লাগিল। এই স্ত্রীলোকের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় আছে—ইনি সেই বামনশূন্য বামনী—নিশি ঠাকুরানি।

নিশি বলিল, 'এইবার ঠিক বলেছ—তোমার নাম ব্রজেশ্বর রায়।'

ব্রজেশ্বরের একটু গোল বাধিল। পরদার আড়ালে কিছুই দেখিতে পাইতেছিলেন না—কিন্তু কথার আওয়াজে সন্দেহ হইল যে, যে কথা কহিতেছিল, এ সে বুঝি নয়। তার আওয়াজটা বড় মিঠে লাগিতেছিল—এ বুঝি তত মিঠে নয়। যাই হউক, কথার উত্তরে ব্রজেশ্বর বলিলেন, 'যদি আমার পরিচয় জানেন, তবে এই বেলা দরটা চুকাইয়া লউন—আমি স্বস্থানে চলিয়া যাই। কী দরে আমাকে ছাড়িবেন?'

নিশি। এক কড়া কানাকড়ি। সঙ্গে আছে কি? থাকে যদি, দিয়া চলিয়া যান।
ব্রজ। আপাতত সঙ্গে নাই।
নিশি। বজরা হইতে আনিয়া দিন।
ব্রজ। বজরাতে যাহা ছিল, তাহা আপনার অনুচরেরা লইয়া আসিয়াছে। আর এক কড়া কানাকড়িও নাই।
নিশি। মাঝিদের কাছে ধার করিয়া আনুন।
ব্রজ। মাঝিরাও কানাকড়ি রাখে না।
নিশি। তবে যতদিন না আপনার উপযুক্ত মূল্য আনাইয়া দিতে পারেন, ততদিন কয়েদ থাকুন।

ব্রজেশ্বর তারপর শুনিলেন, কামরার ভিতরে আর একজন কে —কণ্ঠে সেও বোধহয় স্ত্রীলোক—দেবীকে বলিতেছে, 'রানিজি! যদি এক কড়া কানাকড়িই এই মানুষটার দর হয়, তবে আমি এক কড়া কানাকড়ি দিতেছি। আমার কাছে উহাকে বিক্রি করুন।'

ব্রজেশ্বর শুনিলেন, রানি উত্তর করিল, 'ক্ষতি কী? কিন্তু মানুষটাকে নিয়ে তুমি কী করিবে? ব্রাহ্মণ—জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে পারিবে না।'

ব্রজেশ্বর প্রত্যুত্তরও শুনিলেন, রমণী বলিল, 'আমার রাঁধিবার ব্রাহ্মণ নাই। আমাকে রাঁধিয়া দিবে।'

তখন নিশি ব্রজেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিল, 'শুনিলেন, আপনি বিক্রি হইলেন —আমি কানাকড়ি পাইয়াছি। যে আপনাকে কিনিল, আপনি তাহার সঙ্গে যান, রাঁধিতে হইবে।'

ব্রজেশ্বর বলিল, 'কই তিনি?'

নিশি। স্ত্রীলোক—বাহিরে যাইবে না, আপনি ভিতরে আসুন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর অনুমতি পাইয়া, পরদা তুলিয়া, কামরার ভিতরে প্রবেশ করিল। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিল, ব্রজেশ্বর তাহাতে বিস্মিত হইল। কামরার কাষ্ঠের দেওয়াল, বিচিত্র চারুচিত্রিত। যেমন আশ্বিন মাসে ভক্তজনে দশভুজা প্রতিমা পূজা করিবার মানসে প্রতিমার চাল চিত্রিত করায়—এ তেমনি চিত্র। শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধ ; মহিষাসুরের যুদ্ধ ; দশ অবতার ; অষ্ট নায়িকা ; সপ্ত মাতৃকা ; দশ মহাবিদ্যা ; কৈলাস; বৃন্দাবন ; লঙ্কা ; ইন্দ্রালয় ; নবনারী-কুঞ্জর ; বস্ত্রহরণ ; সকলই চিত্রিত। সেই কামরায় চারি আঙ্গুল পুরু গালিচা পাতা, তাহাতেও কত চিত্র। তার উপর কত উচ্চ মসনদ—মখমলের কামদার বিছানা, তিন দিকে সেইরূপ বালিশ ; সোনার আতরদান, তারই গোলাব-পাশ, সোনার বাটা, সোনার পুষ্পপাত্র—তাহাতে রাশীকৃত সুগন্ধি ফুল ; সোনার আলবোলা ; পোরজরের সট্‌কা—সোনার মুখনলে মতির থোপ দুলিতেছে—তাহাতে মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজা আছে। দুই পাশে দুই রুপার ঝাড়, তাহাতে বহুসংখ্যক সুগন্ধি দীপ রুপার পরীর মাথার উপর জ্বলিতেছে; উপরের ছাদ হইতে একটি ছোট দীপ সোনার শিকলে লটকানো আছে। চারি কোণে চারিটি রুপার পুতুল, চারিটি বাতি হাতে করিয়া ধরিয়া আছে। মসনদের উপর একজন স্ত্রীলোক শুইয়া আছে—তাহার মুখের উপর একখানা বড় মিহি জরির বুটাদার ঢাকাই রুমাল ফেলা আছে। মুখ ভালো দেখা যাইতেছে না—কিন্তু তপ্তকাঞ্চন-গৌরবর্ণ আর কৃষ্ণকুঞ্চিত কেশ অনুভূত হইতেছে ; কানের গহনা কাপড়ের ভিতর হইতে জ্বলিতেছে—তার অপেক্ষা বিস্তৃত চক্ষের তীব্র কটাক্ষ আরো ঝলসিতেছে। স্ত্রীলোকটি শুইয়া আছে—ঘুমায় নাই।

ব্রজেশ্বর দরবার-কামরায় প্রবেশ করিয়া শয়ানা সুন্দরীকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রানিজিকে কী বলিয়া আশীর্বাদ করিব ?'

সুন্দরী উত্তর করিল, 'আমি রানিজি নই।'

ব্রজেশ্বর দেখিল, এতক্ষণ ব্রজেশ্বর যাহার সঙ্গে কথা কহিতেছিল, এ তাহার আওয়াজ নহে। অথচ তার আওয়াজ হইতে পারে ; কেননা, বেশ স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, এ স্ত্রীলোক কণ্ঠ বিকৃত করিয়া কথা কহিতেছে। মনে করিল, বুঝি দেবী চৌধুরানি হরবোলা, মায়াবিনী—এত কুহক না জানিলে মেয়েমানুষ হইয়া ডাকাইতি করে? প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিল, 'এই যে তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতেছিলাম—তিনি কোথায় ?'

সুন্দরী বলিল, 'তোমাকে আসিতে অনুমতি দিয়া, তিনি শুইতে গিয়াছেন। রানিতে তোমার কী প্রয়োজন ?'

ব্র। 'তুমি কে ?'

সুন্দরী। তোমার মুনিব।

ব্র। আমার মুনিব ?

সুন্দরী। জানো না, এইমাত্র তোমাকে এক কড়া কানাকড়ি দিয়া কিনিয়াছি ?

ব্র। সত্য বটে। তা তোমাকেই কী বলিয়া আশীর্বাদ করিব ?

সুন্দরী। আশীর্বাদের রকম আছে নাকি ?

ব্র। স্ত্রীলোকের পক্ষে আছে। সধবাকে একরকম আশীর্বাদ করিতে হয়—বিধবাকে অন্যরূপ। পুত্রবতীকে—

সুন্দরী। আমাকে 'শিগ্‌গির মর' বলিয়া আশীর্বাদ কর।

ব্র। সে আশীর্বাদ আমি কাহাকেও করি না—তোমার একশো তিন বছর পরমায়ু হৌক।

সুন্দরী। আমার বয়স পঁচিশ বৎসর। আটাত্তর বৎসর ধরিয়া তুমি আমার ভাত রাঁধিবে ?

ব্র। আগে এক দিন তো রাঁধি। খেতে পার তো, নাহয় আটাত্তর বৎসর রাঁধিব।

সুন্দরী। তবে বসো—কেমন রাঁধিতে জানো, পরিচয় দাও।

ব্রজেশ্বর তখন সেই কোমল গালিচার উপর বসিল। সুন্দরী জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার নাম কী ?'

ব্র। তা তো তোমরা সকলেই জানো, দেখিতেছি। আমার নাম ব্রজেশ্বর। তোমার নাম কী? গলা অত মোটা করিয়া কথা কহিতেছ কেন? তুমি কি চেনা মানুষ?

সুন্দরী। আমি তোমার মুনিব—আমাকে 'আপুনি' 'মশাই' আর 'আজ্ঞে' বলিবে।

ব্র। আজ্ঞে, তাই হইবে। আপনার নাম?

সুন্দরী। আমার নাম পাঁচকড়ি। কিন্তু তুমি আমার ভৃত্য, আমার নাম ধরিতে পারিবে না। বরং বল তো আমিও তোমার নাম ধরিব না।

ব্র। তবে কী বলিয়া ডাকিলে আমি 'আজ্ঞা' বলিব?

পাঁচকড়ি। আমি 'রামধন' বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি আমাকে 'মুনিব ঠাকুরুন' বলিও। এখন তোমার পরিচয় দাও—বাড়ি কোথায়?

ব্র। এক কড়ায় কিনিয়াছ—অত পরিচয়ের প্রয়োজন কী?

পাঁচ। ভালো, সে কথা নাই বলিলে। রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিব। রাঢ়ী, না বারেন্দ্র, না বৈদিক?

ব্র। হাতের ভাত তো খাইবেন —যাই হই না।

পাঁচ। তুমি যদি আমার স্বশ্রেণী না হও—তাহা হইলে তোমাকে অন্য কাজ দিব।

ব্র। অন্য কী কাজ?

পাঁচ। জল তুলিবে, কাঠ কাটিবে—কাজের অভাব কী!

ব্র। আমি রাঢ়ী।

পাঁচ। তবে তোমায় জল তুলিতে, কাঠ কাটিতে হইবে—আমি বারেন্দ্র। তুমি রাঢ়ী—কুলীন, না বংশজ?

ব্র। এ-কথা তো বিবাহের সম্বন্ধের জন্যই প্রয়োজন হয়। সম্বন্ধ জুটিবে কী? আমি কৃতদার।

পাঁচ। কৃতদার? কয় সংসার করিয়াছেন?

ব্র। জল তুলিতে হয়—জল তুলিব—অত পরিচয় দিব না।

তখন পাঁচকড়ি দেবী রানিকে ডাকিয়া বলিল, 'রানিজি! বামুনঠাকুর বড় অবাধ্য। কথার উত্তর দেয় না।'

নিশি পর-কক্ষ হইতে উত্তর করিল, 'বেত লাগাও।'

তখন দেবীর একজন পরিচারিকা শপাৎ করিয়া একগাছা লিকলিকে সরু বেত পাঁচকড়ির বিছানায় ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেল। পাঁচকড়ি বেত পাইয়া ঢাকাই রুমালের ভিতর মধুর অধর চারু দন্তে টিপিয়া বিছানায় বার দুই বেতগাছা আছড়াইল। ব্রজেশ্বরকে বলিল, 'দেখিয়াছ?'

ব্রজেশ্বর হাসিল। 'আপনারা সব পারেন। কী বলিতে হইবে বলিতেছি।'

পাঁচ। তোমার পরিচয় চাই না—পরিচয় লইয়া কী হইবে? তোমার রান্না তো খাইব না। তুমি আর কী কাজ করিতে পার, বল?

ব্র। হুকুম করুন।

পাঁচ। জল তুলিতে জানো?

ব্র। না।

পাঁচ। কাঠ কাটিতে জানো?

ব্র। না।

পাঁচ। বাজার করিতে জানো?

ব্র। মোটামুটি রকম।

পাঁচ। মোটামুটিতে চলিবে না। বাতাস করিতে জানো?

ব্র। পারি।

পাঁচ। আচ্ছা, এই চামর নাও, বাতাস কর।

ব্রজেশ্বর চামর লইয়া বাতাস করিতে লাগিল। পাঁচকড়ি বলিল, 'আচ্ছা, একটা কাজ জানো? পা টিপিতে জানো?'

ব্রজেশ্বরের দুরদৃষ্ট, তিনি পাঁচকড়িকে মুখরা দেখিয়া, একটি ছোটরকমের রসিকতা করিতে গেলেন। এই দস্যুনেত্রীদিগের কোনোরকমে খুশি করিয়া মুক্তি লাভ করেন, সে অভিপ্রায়ও ছিল। অতএব পাঁচকড়ির কথার উত্তরে বলিলেন, 'তোমাদের মতো সুন্দরীর পা টিপিব, সে তো ভাগ্য—'

'তবে একবার টেপো না।' বলিয়া অমনি পাঁচকড়ি আলতাপরা রাঙা পাখানি ব্রজেশ্বরের উরুর উপর তুলিয়া দিল।

ব্রজেশ্বর নাচার—আপনি পা টেপার নিমন্ত্রণ লইয়াছেন, কী করেন। ব্রজেশ্বর কাজেই দুই হাতে পা টিপিতে আরম্ভ করিলেন। মনে করিলেন, 'এ কাজটি ভালো হইতেছে না, ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। এখন উদ্ধার পেলে বাঁচি।'

তখন দুষ্টা পাঁচকড়ি ডাকিল, 'রানিজি! একবার এদিকে আসুন।'

দেবী আসিতেছে, ব্রজেশ্বর পায়ের শব্দ পাইল। পা নামাইয়া দিল। পাঁচকড়ি হাসিয়া বলিল, 'সে কী! পিছাও কেন?' পাঁচকড়ি সহজ গলায় কথা কহিয়াছিল। ব্রজেশ্বর বড় বিস্মিত হইলেন—সে কী! এ গলা তো চেনা গলাই বটে। সাহস করিয়া ব্রজেশ্বর পাঁচকড়ির মুখঢাকা রুমালখানা খুলিয়া লইলেন। পাঁচকড়ি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ব্রজেশ্বর বিস্মিত হইয়া বলিল, 'সে কী! এ কী! তুমি—তুমি সাগর?'

পাঁচকড়ি বলিল, 'আমি সাগর। গঙ্গা নই—যমুনা নই—বিল নই—খাল নই—সাক্ষাৎ সাগর। তোমার বড় অভাগ্য—না? যখন পরের স্ত্রী মনে করিয়াছিলে, তখন বড় আহ্লাদ করিয়া পা টিপিতেছিলে, আর যখন ঘরের স্ত্রী হইয়া পা টিপিতে বলিয়াছিলাম, তখন রাগে গরগর করিয়া চলিয়া গেলে! যাক, এখন আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে। তুমি আমার পা টিপিয়াছ। এখন আমার মুখপানে চাহিয়া দেখিতে পার। আমায় ত্যাগ কর, আর পায়ে রাখো—এখন জানিলে, আমি যথার্থ ব্রাহ্মণের মেয়ে।'

সপ্তম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর কিয়ৎক্ষণ বিহ্বল হইয়া রহিল। শেষে জিজ্ঞাসা করিল, 'সাগর! তুমি এখানে কেন?' সাগর বলিল, 'সাগরের স্বামী! তুমিই বা এখানে কেন?'

ব্র। তাই কি? আমি কয়েদি, তুমিও কি কয়েদি? আমাকে ধরিয়া আনিয়াছে। তোমাকেও কি ধরিয়া আনিয়াছে?

সাগর। আমি কয়েদি নই, আমাকে কেহ ধরিয়া আনে নাই। আমি ইচ্ছাক্রমে দেবী রানির সাহায্য লইয়াছি। তোমাকে দিয়া পা টিপাইব বলিয়া দেবী রানির রাজ্যে বাস করিতেছি।

তখন নিশি আসিল। ব্রজেশ্বর তাহার বস্ত্রালঙ্কারে জাঁকজমক দেখিয়া মনে করিল, 'এই দেবী চৌধুরানি।' ব্রজেশ্বর সম্ভ্রম রাখিবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল। নিশি বলিল, 'স্ত্রীলোক ডাকাইত হইলেও তাহার অত সম্মান করিতে নাই। আপনি বসুন। এখন শুনিলেন, কেন আপনার বজরায় আমরা ডাকাইতি করিয়াছি? এখন সাগরের পণ উদ্ধার হইয়াছে; এখন আপনাতে আর আমাদের প্রয়োজন নাই, আপনি আপনার নৌকায় ফিরিয়া যাইলে কেহ আটক করিবে না। আপনার জিনিশপত্র এক কপর্দক কেহ লইবে না, সব আপনার বজরায় ফিরিয়া পাঠাইয়া দিতেছি। কিন্তু এই একটা কপর্দক—এই পোড়ারমুখী সাগর, ইহার কী হইবে? এ কি বাপের বাড়ি ফিরিয়া যাইবে? ইহাকে আপনি লইয়া যাইবেন কি? মনে করুন, আপনি উহার এক কড়ার কেনা গোলাম।'

বিস্ময়ের উপর বিস্ময়! ব্রজেশ্বর বিহ্বল হইল। তবে ডাকাইতি সব মিথ্যা, এরা ডাকাইত নয়!

ব্রজেশ্বর ক্ষণেক ভাবিল, ভাবিয়া শেষে বলিল, 'তোমরা আমায় বোকা বানাইলে। আমি মনে করিয়াছিলাম, দেবী চৌধুরানির দলে আমার বজরায় ডাকাইতি করিয়াছে।'

তখন নিশি বলিল, 'সত্য সত্যই দেবী চৌধুরানির এই বজরা। দেবী রানি সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন।'—কথা শেষ হইতে-না-হইতেই ব্রজেশ্বর বলিল, 'দেবী রানি সত্য সত্যই ডাকাইতি করেন—তবে আপনি কি দেবী রানি নন?

নিশি। আমি দেবী নই। আপনি যদি রানিজিকে দেখিতে চান; তিনি দর্শন দিলেও দিতে পারেন। কিন্তু যা বলিতেছিলাম, তা আগে শুনুন। আমরা সত্য সত্যই ডাকাইতি করি, কিন্তু আপনার উপর ডাকাইতি করিবার আর কোনো উদ্দেশ্য নাই, কেবল সাগরের প্রতিজ্ঞা রক্ষা। এখন সাগর বাড়ি যায় কী প্রকারে? প্রতিজ্ঞা তো রক্ষা হইল।

ব্র। আসিল কী প্রকারে?

নিশি। রানিজির সঙ্গে।

ব্র। আমিও তো সাগরের পিত্রালয়ে গিয়াছিলাম—সেখান হইতেই আসিতেছি। কই, সেখানে তো রানিজিকে দেখি নাই?

নিশি। রানিজি আপনার পরে সেখানে গিয়াছিলেন।

ব্র। তবে ইহার মধ্যে এখানে আসিলেন কী প্রকারে?

নিশি। আমাদের ছিপ দেখিয়াছেন তো? পঞ্চাশ বোটে।

ব্র। তবে আপনারাই কেন ছিপে করিয়া সাগরকে রাখিয়া আসুন না?

নিশি। তাতে একটু বাধা আছে। সাগর কাহাকেও না বলিয়া রানির সঙ্গে আসিয়াছে—এজন্য অন্য লোকের সঙ্গে ফিরিয়া গেলে, সবাই জিজ্ঞাসা করিবে, কোথায় গিয়াছিলে। আপনার সঙ্গে ফিরিয়া গেলে উত্তরের ভাবনা নাই।

ব্র। ভালো, তাই হইবে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া ছিপ হুকুম করিয়া দিন।

'দিতেছি' বলিয়া নিশি সেখান হইতে সরিয়া গেল।

তখন সাগরকে নির্জনে পাইয়া ব্রজেশ্বর বলিল, 'সাগর! তুমি কেন এমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে?'

মুখে অঞ্চল দিয়া—এবার ঢাকাই রুমাল নহে—কাপড়ের যেখানটা হাতে উঠিল, সেইখানটা মুখে ঢাকা দিয়া সাগর কাঁদিল—সেই মুখরা সাগর টিপিয়া টিপিয়া, কাঁপিয়া কাঁপিয়া, চুপি চুপি, ভারি কান্না কাঁদিল। চুপি চুপি—পাছে দেবী শোনে।

কান্না থামিলে ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, 'সাগর! তুমি আমায় ডাকিলে না কেন? ডাকিলেই সব মিটিয়া যাইত।'

সাগর কষ্টে রোদন সংবরণ করিয়া, চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'কপালের ভোগ, কিন্তু আমি নাই ডাকিয়াছি—তুমিই বা আসিলে না কেন?'

ব্র। তুমি আমায় তাড়াইয়া দিয়াছিলে—না ডাকিলে যাই কী বলিয়া?

এই সকল কথাবার্তা যথাশাস্ত্র সমাপন হইলে ব্রজেশ্বর বলিলেন, 'সাগর! তুমি ডাকাইতের সঙ্গে কেন আসিলে?'

সাগর বলিল, 'দেবী—সম্বন্ধে আমার ভগিনী হয়, পূর্বে জানাশুনা ছিল। তুমি চলিয়া আসিলে, সে গিয়া আমার বাপের বাড়ি উপস্থিত হইল। আমি কাঁদিতেছি দেখিয়া সে বলিল, 'কাঁদো কেন ভাই—তোমার শ্যামচাঁদকে আমি বেঁধে এনে দিব। আমার সঙ্গে দুইদিনের তরে এসো।' তাই আমি আসিলাম। দেবীকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবার আমার বিশেষ কারণ আছে। তোমার সঙ্গে আমি পলাইয়া চলিলাম, এই কথা আমি চাকরানিকে বলিয়া আসিয়াছি। তোমার জন্য এইসব আলবোলা, শটকা প্রভৃতি সাজাইয়া রাখিয়াছি—একবার তামাক-টামাক খাও, তার পর যেও।'

ব্রজেশ্বর বলিলেন, 'কই, যে মালিক সে তো কিছু বলে না।'

তখন সাগর দেবীকে ডাকিল। দেবী আসিল না—নিশি আসিল।

নিশিকে দেখিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, 'এখন আপনি ছিপ হুকুম করিলেই যাই।'

নিশি। ছিপ তোমারই। কিন্তু দেখ, তুমি রানির বোনাই—কুটুম্বকে স্বস্থানে পাইয়া আমরা আদর করিলাম না—কেবল অপমানই করিলাম, এ বড় দুঃখ থাকে। আমরা ডাকাইত বলিয়া আমাদের কি হিন্দুয়ানি নাই?

ব্র। কী করিতে বলেন?

নিশি। প্রথমে উঠিয়া ভালো হইয়া বসো।

নিশি মসনদ দেখাইয়া দিল। ব্রজেশ্বর শুধু গালিচায় বসিয়াছিল। বলিল, 'কেন, আমি বেশ বসিয়া আছি।'

তখন নিশি সাগরকে বলিল, 'ভাই তোমার সামগ্রী তুমি তুলিয়া বসাও। জানো, আমরা পরের দ্রব্য ছুঁই না।' হাসিয়া বলিল, 'সোনা-রুপা ছাড়া।'

ব্র। তবে আমি কি পিতল-কাঁসার দলে পড়িলাম?

নিশি। আমি তো তা মনে করি—পুরুষমানুষ স্ত্রীলোকের তৈজসের মধ্যে। না থাকিলে ঘর-সংসার চলে না—তাই রাখিতে হয়। কথায় কথায় সক্‌ড়ি হয়। মাজিয়া ঘষিয়া ধুইয়া ঘরে তুলিতে নিত্য প্রাণ বাহির হইয়া যায়। নে ভাই সাগর, তোর ঘটিবাটি তফাৎ কর—কী জানি, যদি সক্‌ড়ি হয়।

ব্র। একে তো পিতল কাঁসা—তার মধ্যে আবার ঘটিবাটি! ঘড়াটা গাড়ুটার মধ্যে গণ্য হইবারও যোগ্য নই?

নিশি। আমি ভাই বৈষ্ণবী, তৈজসের ধার ধারি না—আমাদের দৌড় মালসা পর্যন্ত। তৈজসের খবর সাগরকে জিজ্ঞাসা কর।

সাগর। আমি ঠিক কথা জানি। পুরুষমানুষ তৈজসের মধ্যে কলসি। সদাই অন্তঃশূন্য—আমরা যাই গুণবতী, তাই জল পুরিয়া পূর্ণকুম্ভ করিয়া রাখি।

নিশি বলিল, 'ঠিক বলিয়াছিস —তাই মেয়েমানুষে এ জিনিশ গলায় বাঁধিয়া সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে। নে ভাই, তোর কলসি, কলসি-পিঁড়ির উপর তুলিয়া রাখ।'

ব্র। কলসি মানে মানে আপনি পিঁড়ির উপর উঠিতেছে।

এই কথা বলিয়া ব্রজেশ্বর আপনি মসনদের উপর উঠিয়া বসিল। হঠাৎ দুই দিক হইতে দুইজন পরিচারিকা—সুন্দরী যুবতী, বহুমূল্য বসন-ভূষিতা—দুইটা সোনাবাঁধা চামর হাতে করিয়া ব্রজেশ্বরের দুই পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল। আজ্ঞা না পাইয়াও তাহারা ব্যজন করিতে লাগিল। নিশি তখন সাগরকে বলিল, 'যা, এখন তোর স্বামীর জন্য আপন হাতে তামাকু সাজিয়া লইয়া আয়।'

সাগর ক্ষিপ্রহস্তে সোনার আলবোলার উপর হইতে কলিকা লইয়া গিয়া, শীঘ্র মৃগনাভি-সুগন্ধি তামাকু সাজিয়া আনিল। আলবোলায় চড়াইয়া দিল। ব্রজেশ্বর বলিলেন, 'আমাকে একটা হুঁকায় নল করিয়া তামাকু দাও।'

নিশি বলিল, 'কোনো শঙ্কা নাই—ঐ আলবোলা উৎসৃষ্ট নয়। কেহ কখনো উহাতে তামাকু খায় নাই। আমরা কেহ তামাকু খাই না।'

ব্র। সে কী! তবে এ আলবোলা কেন?

নিশি। দেবীর রানিগিরির দোকানদারি—

ব্র। তা হৌক—আমি যখন আসিলাম, তখন যে তামাকু সাজা ছিল—কে খাইতেছিল?

নিশি। কেহ না—সাজাও দোকানদারি—

ঐ আলবোলা সেইদিন বাহির হইয়াছে—ঐ তামাকু সেইদিন কেনা হইয়াছে—সাগরের স্বামী আসিবে বলিয়া। ব্রজেশ্বর মুখনলটি পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন—অভুক্ত বোধ হয়। তখন ব্রজেশ্বর ধূমপানের অনির্বচনীয় সুখে মগ্ন হইলেন। নিশি তখন সাগরকে বলিল, 'তুই পোড়ারমুখী, আর দাঁড়াইয়া কী করিস্—পুরুষমানুষে হুঁকার নল মুখে করিলে আর কি স্ত্রী পরিবারকে মনে ঠাঁই

দেয়? যা তুই, গোটাকতক পান সাজিয়া আন। দেখিস—আপন হাতে পান সাজিয়া আনিস, পরের সাজা আনিস না, পারিস যদি একটু ওষুধ করিস।'

সাগর বলিল, 'আপন হাতেই সাজা আছে—ওষুধ জানিলে আমার এমন দশা হইবে কেন?'

এই বলিয়া সাগর কর্পূর চুয়া গোলাপে সুগন্ধি পানের রাশি সোনার বাটা পুরিয়া আনিল। তখন নিশি বলিল, 'তোর স্বামীকে অনেক বকেছিস—কিছু জলখাবার নিয়ে আয়।'

ব্রজেশ্বরের মুখ শুকাইল, 'সর্বনাশ! এত রাত্রে জলখাবার! ঐটি মাফ করিও।'

কিন্তু কেহ তাহার কথা শুনিল না—সাগর বড় তাড়াতাড়ি আর এক কামরায় ঝাঁট দিয়া, জলের হাতে মুছিয়া, একখানা বড় ভারী পুরু আসন পাতিয়া চারি-পাঁচখানা রুপার থালে সামগ্রী সাজাইয়া ফেলিল। স্বর্ণপাত্রে উত্তম সুগন্ধি শীতল জল রাখিয়া দিল। জানিতে পারিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে বলিল, 'ঠাঁই হইয়াছে—উঠ।' ব্রজেশ্বর উঁকি মারিয়া দেখিয়া, নিশির কাছে জোড়হাত করিল। বলিল, 'ডাকাইতি করিয়া ধরিয়া আনিয়া কয়েদ করিয়াছ—সে অত্যাচার সহিয়াছে—কিন্তু এত রাত্রে এ অত্যাচার সহিবে না—দোহাই।'

স্ত্রীলোকেরা মার্জনা করিল না। ব্রজেশ্বর অগত্যা কিছু খাইল। সাগর তখন নিশিকে বলিল, 'ব্রাহ্মণভোজন করাইলে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়।' নিশি বলিল, 'দক্ষিণা রানি স্বয়ং দিবেন। এসো ভাই, রানি দেখিবে এসো।' এই বলিয়া নিশি ব্রজেশ্বরকে আর-এক কামরায় সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

নিশি ব্রজেশ্বরকে সঙ্গে করিয়া দেবীর শয্যাগৃহে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, শয়নঘর দরবার-কামরার মতো অপূর্ব সজ্জায় সজ্জিত। বেশিরভাগ, একখানা সুবর্ণমণ্ডিত মুক্তার ঝালরযুক্ত ক্ষুদ্র পালঙ্ক আছে। কিন্তু ব্রজেশ্বরের সে-সকল দিকে চক্ষু ছিল না। এত ঐশ্বর্যের অধিকারিনী প্রথিতনাম্নী দেবীকে দেখিলেন। দেখিলেন, কামরার ভিতর অনাবৃত কাষ্ঠের উপর বসিয়া, অর্ধাবগুণ্ঠনবতী একটি স্ত্রীলোক। নিশি ও সাগরে, ব্রজেশ্বর যে চাঞ্চল্যময়তা দেখিয়াছিলেন, ইহাতে তাহার কিছুই নাই। এ স্থিরা, ধীরা—নিম্নদৃষ্টি, লজ্জাবনতমুখী। নিশি ও সাগর, বিশেষত নিশি সর্বাঙ্গে রত্নালঙ্কারমণ্ডিতা, বহুমূল্য বসন আবৃতা—কিন্তু ইহার তা কিছুই নাই। দেবী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের ভরসায় বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াছিলেন, ইহা আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি। কিন্তু সাক্ষাতের সময় উপস্থিত হইলে, দেবী সে সকলই ত্যাগ করিয়া সামান্য বস্ত্র পরিয়া, হাতে কেবল একখানি মাত্র সামান্য অলঙ্কার রাখিয়া ব্রজেশ্বরের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। প্রথমে নিশির বুদ্ধিতে দেবী ভ্রমে পড়িয়াছিল; শেষে বুঝিতে পারিয়া আপনাআপনি তিরস্কার করিয়াছিল—'ছি! ছি! ছি! কী করিয়াছি! ঐশ্বর্যের ফাঁদ পাতিয়াছি?' তাই এ বেশ পরিবর্তন।

ব্রজেশ্বরকে পৌঁছাইয়া দিয়া নিশি চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর প্রবেশ করিলে, দেবী গাত্রোত্থান করিয়া ব্রজেশ্বরকে প্রণাম করিল। দেখিয়া ব্রজেশ্বর আরো বিস্মিত হইল—কই, আর কেহ তো প্রণাম করে নাই! দেবী তখন ব্রজেশ্বরের সম্মুখে দাঁড়াইল—ব্রজেশ্বর দেখিল, যথার্থ দেবীমূর্তি! এমন আর কখনো দেখিয়াছে কি? হ্যাঁ, ব্রজ আর একবার এমনই দেখিয়াছিল। সে আরো মধুর—কেননা, দেবীমূর্তি তখন বালিকার মূর্তি—ব্রজেশ্বরের তখন প্রথম যৌবন। হায়! এ যদি সেই হইত! এ মুখ দেখিয়া, ব্রজেশ্বরের সেই মুখ মনে পড়িল, কিন্তু দেখিলেন এ মুখ সে মুখ নহে। তার কি কিছুই এতে নাই? আছে বৈকি—কিছু আছে। ব্রজেশ্বর তাই অবাক হইয়া দেখিতে লাগিল। সে তো অনেক দিন মরিয়া গিয়াছে। তবে মানুষে মানুষে কখনো কখনো এমন সাদৃশ্য থাকে যে, একজনকে দেখিলে আর

একজনকে মনে পড়ে। এ তাই না ব্রজ?

ব্রজ তাই মনে করিল, কিন্তু সেই সাদৃশ্যেই হৃদয় ভরিয়া গেল—ব্রজের চক্ষে জল আসিল, পড়িল না। তাই দেবী সে জল দেখিতে পাইল না। দেখিতে পাইলে আজ একটা কাণ্ডকারখানা হইয়া যাইত। দুইখানা মেঘেই বৈদ্যুতি ভরা।

প্রণাম করিয়া নিম্ননয়নে দেবী বলিতে লাগিল, 'আমি আপনাকে আজ জোর করিয়া ধরিয়া আনিয়া বড় কষ্ট দিয়াছি। কেন এমন কুকর্ম করিয়াছি, শুনিয়াছেন। আমার অপরাধ লইবেন না।'

ব্রজেশ্বর বলিলেন, 'আমার উপকারই করিয়াছেন।' বেশি কথা বলিবার ব্রজেশ্বরের শক্তি নাই।

দেবী আরো বলিল, 'আপনি আমার এখানে দয়া করিয়া জলগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে আমার বড় মর্যাদা বাড়িয়াছে। আপনি কুলীন—আপনারও মর্যাদা রাখা আমার কর্তব্য। আপনি আমার কুটুম্ব। যাহা মর্যাদাস্বরূপ আমি আপনাকে দিতেছি, তাহা গ্রহণ করুন।'

ব্র। স্ত্রীর মতো কোন্ ধন? আপনি তাই আমাকে দিয়াছেন। ইহার বেশি আর কী দিবেন?

ও ব্রজেশ্বর! কী বলিলে? স্ত্রীর মতো ধন আর নাই? তবে বাপ-বেটায় মিলিয়া প্রফুল্লকে তাড়াইয়া দিয়াছিলে কেন?

পালঙ্কের পাশে একটি রুপার কলসি ছিল—তাহা টানিয়া বাহির করিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের নিকটে রাখিল, বলিল, 'ইহাই গ্রহণ করিতে হইবে।'

ব্রজ। আপনার বজরায় এত সোনা-রুপার ছড়াছড়ি যে, এই কলসিটা নিতে আপত্তি করিলে, সাগর আমায় বকিবে। কিন্তু একটা কথা আছে—

কথাটা কী —দেবী বুঝিল, বলিল, 'আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, এ চুরি-ডাকাইতির নহে। আমার নিজের কিছু সঙ্গতি আছে—শুনিয়া থাকিবেন। অতএব গ্রহণপক্ষে কোনো সংশয় করিবেন না।'

ব্রজেশ্বর সম্মত হইল—কুলীনের ছেলের আর অধ্যাপক ভট্টাচর্যের 'বিদায়' বা 'মর্যাদা' গ্রহণে লজ্জা ছিল না—এখনো বোধহয় নাই। কলসিটা বড় ভারী ঠেকিল, ব্রজেশ্বর সহজে তুলিতে পারিলেন না। বলিলেন, 'এ কী এ? কলসিটা নিরেট নাকি?'

দেবী। টানিবার সময়ে উহার ভিতর শব্দ হইয়াছিল—নিরেট সম্ভবে না।

ব্র। তাই তো? এতে কী আছে?

কলসিতে ব্রজেশ্বর হাত পুরিয়া তুলিল—মোহর। কলসি মোহরে পরিপূর্ণ।

ব্র। এগুলি কিসে ঢালিয়া রাখিব?

দেবী। ঢালিয়া রাখিবেন কেন? এগুলি সমস্তই আপনাকে দিয়াছি।

ব্র। কী!

দেবী। কেন?

ব্র। কত মোহর আছে?

দেবী। তেত্রিশ শো।

ব্র। তেত্রিশ শো মোহরে পঞ্চাশ হাজার টাকার উপর। সাগর আপনাকে টাকার কথা বলিয়াছে?

দেবী। সাগরের মুখে শুনিয়াছি, আপনার পঞ্চাশ হাজার টাকার বিশেষ প্রয়োজন।

ব্র। তাই দিতেছেন?

দেবী। টাকা আমার নহে, আমার দান করিবার অধিকার নাই। টাকা দেবতার, দেবত্র আমার জিম্মা। আমি আমার দেবত্র সম্পত্তি হইতে আপনাকে এই টাকা কর্জ দিতেছি।

ব্র। আমার এ টাকার নিতান্ত প্রয়োজন পড়িয়াছে—বোধহয়, চুরি ডাকাতি করিয়াও যদি আমি এ টাকা সংগ্রহ করি, তাহা হইলেও অধর্ম হয় না; কেননা, এ টাকা নহিলে আমার বাপের জাতি রক্ষা হয় না। আমি এ টাকা লইব। কিন্তু কবে পরিশোধ করিতে হইবে?

দেবী। দেবতার সম্পত্তি, দেবতা পাইলেই হইল। আমার মৃত্যুসংবাদ শুনিলে পর ঐ টাকার আসল আর এক মোহর সুদ দেবসেবায় ব্যয় করিবেন

ব্র। সে আমারই ব্যয় করা হইবে। সে আপনাকে ফাঁকি দেওয়া হইবে। আমি ইহাতে স্বীকৃত নহি।

দেবী। আপনার যেরূপ ইচ্ছা, সেইরূপে পরিশোধ করিবেন।

ব্র। আমার টাকা জুটিলে আপনাকে পাঠাইয়া দিব।

দেবী। আপনার লোক কেহ আমার কাছে আসিবে না, আসিতেও পারিবে না।

ব্র। আমি নিজে টাকা লইয়া আসিব।

দেবী। কোথায় আসিবেন? আমি একস্থানে থাকি না।

ব্র। যেখানে বলিয়া দিবেন।

দেবী। দিন ঠিক করিয়া বলিলে, আমি স্থান ঠিক করিয়া বলিতে পারি।

ব্র। আমি মাঘ-ফাল্গুনে টাকা সংগ্রহ করিতে পারিব। কিন্তু একটু বেশি করিয়া সময় লওয়া ভালো। বৈশাখ মাসে টাকা দিব।

দেবী। তবে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের সপ্তমীর রাত্রে এই ঘাটেই টাকা আনিবেন। সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত আমি এখানে থাকিব। সপ্তমীর চন্দ্রাস্তের পর আসিলে আমার দেখা পাইবেন না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইলেন। তখন দেবী পরিচারিকাদিগকে আজ্ঞা দিলেন, মোহরের ঘড়া ছিপে উঠাইয়া দিয়া আইসে। পরিচারিকারা ঘড়া ছিপে লইয়া গেল। ব্রজেশ্বরও দেবীকে আশীর্বাদ করিয়া ছিপে যাইতেছিলেন। তখন দেবী নিষেধ করিয়া বলিলেন, 'আর একটা কথা বাকি আছে। এ তো কর্জ দিলাম—মর্যাদা দিলাম কই?'

ব্র। কলসিটা মর্যাদা।

দেবী। আপানার যোগ্য মর্যাদা নহে। যথাসাধ্য মর্যাদা রাখিব।

এই বলিয়া দেবী আপনার আঙুল হইতে একটি আঙ্গটি খুলিল। ব্রজেশ্বর তাহা গ্রহণ করিবার জন্য সহাস্য বদনে হাত পাতিলেন। দেবী হাতের উপর আঙ্গটি ফেলিয়া দিল না—ব্রজেশ্বরের হাতখানি ধরিল—আপনি আঙ্গটি পরাইয়া দিবে।

ব্রজেশ্বর জিতেন্দ্রিয়, কিন্তু মনের ভিতর কী একটা গোলমাল হইয়া গেল, জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর তাহা বুঝিতে পারিল না। শরীরে কাঁটা দিল—ভিতরে যেন অমৃতস্রোত ছুটিল। জিতেন্দ্রিয় ব্রজেশ্বর, হাতটা সরাইয়া লইতে ভুলিয়া গেল। বিধাতা এক-এক সময়ে এমনই বাদ সাধেন, যে-সময়ে আপন কাজ ভুলিয়া যাইতে হয়।

তা, দেবী সেই মানসিক গোলযোগের সময় ব্রজেশ্বরের আঙুলে ধীরে ধীরে আঙ্গটি পরাইতে লাগিল। সেই সময়ে ফোঁটা-দুই তপ্ত জল ব্রজেশ্বরের হাতের উপর পড়িল। ব্রজেশ্বর দেখিলেন, দেবীর মুখ চোখের জলে ভাসিয়া যাইতেছে। কী রকম কী হইল, বলিতে পারি না, ব্রজেশ্বর তো জিতেন্দ্রিয়—কিন্তু মনের ভিতর কী একটা গোল বাধিয়াছিল। সেই আর-একখানা মুখ মনে পড়িল—বুঝি, সে মুখে সেই রাত্রে এমনই অশ্রুধারা বহিয়াছিল—সে চোখের জল মোছানোটাও বুঝি মনে পড়িল ; এই সেই, সেই এই, কি এমনই একটা কী গোলমাল বাধিয়া গেল। ব্রজেশ্বর কিছু না বুঝিয়া—কেন জানি না—দেবীর কাঁধে হাত রাখিল, অপর হাতে ধরিয়া মুখখানা তুলিয়া ধরিল—বুঝি মুখখানা প্রফুল্লের মতো দেখিল। বিবশ বিহ্বল হইয়া সেই অশ্রুনিষিক্ত বিম্বাধরে—আ ছি ছি! ব্রজেশ্বর! আবার!

তখন ব্রজেশ্বরের মাথায় যেন আকাশ ভাঙিয়া পড়িল। কী করিলাম! এ কি প্রফুল্ল? সে যে দশ বৎসর মরিয়াছে? ব্রজেশ্বর ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিয়া একেবারে ছিপে গিয়া উঠিল। সাগরকে সঙ্গে লইয়াও গেল না। সাগর 'ধর! ধর! আসামি পলায়!' বলিয়া পিছু পিছু ছুটিয়া গিয়া ছিপে উঠিল। ছিপ খুলিয়া ব্রজেশ্বরকে ও ব্রজেশ্বরের দুই রত্নাধার—একটি সাগর আর একটি কলসি—

ব্রজেশ্বরের নৌকায় পৌঁছাইয়া দিল

এদিকে নিশি আসিয়া দেবীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল, দেবী নৌকার তক্তার উপর লুটাইয়া পড়িয়া কাঁদিতেছে। নিশি তাহাকে উঠাইয়া বসাইল— চোখের জল মুছাইয়া দিল— সুস্থির করিল। তখন নিশি বলিল, 'এই কি মা, তোমার নিষ্কাম ধর্ম? এই কি সন্ন্যাস? ভগবদ্বাক্য কোথায় মা, এখন?'

দেবী চুপ করিয়া রহিল। নিশি বলিল, 'ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মতো হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।'

দেবী চক্ষু মুছিয়া বলিল, 'তুমি যমের বাড়ি যাও।'

নিশি। আপত্তি ছিল না। কিন্তু আমার উপর যমের অধিকার নাই। তুমি সন্ন্যাস ত্যাগ করিয়া ঘরে যাও।

দেবী। সে পথ খোলা থাকিলে আমি এ পথে আসিতাম না। এখন বজরা খুলিয়া দিতে বল। চার পাল উঠাও।

তখন সেই জাহাজের মতো বজরা চারিখানা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মতো উড়িয়া গেল।

নবম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর আপনার নৌকায় আসিয়া গম্ভীর হইয়া বসিল। সাগরের সঙ্গে কথা কহে না। দেখিল, দেবীর বজরা পাল তুলিয়া পক্ষিণীর মতো উড়িয়া গেল। তখন ব্রজেশ্বর সাগরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'বজরা কোথায় গেল?'

সাগর বলিল, 'তা দেবী ভিন্ন আর কেহ জানে না। সে-সকল কথা দেবী আর কাহাকেও বলে না।'

ব্র। দেবী কে?

সা। দেবী দেবী।

ব্র। তোমার কে হয়?

সা। ভগিনী।

ব্র। কীরকম ভগিনী?

সা। জ্ঞাতি।

ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। মাঝিদিগকে ডাকিয়া বলিল, 'তোমরা বড় বজরার সঙ্গে যাইতে পার?' মাঝিরা বলিল, 'সাধ্য কী! ও নক্ষত্রের মতো ছুটিয়াছে।' ব্রজেশ্বর আবার চুপ করিল। সাগর ঘুমাইয়া পড়িল।

প্রভাত হইল, ব্রজেশ্বর বজরা খুলিয়া চলিল।

সূর্যোদয় হইলে সাগর আসিয়া ব্রজেশ্বরের কাছে বসিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবী কি ডাকাতি করে?'

সা। তোমার কী বোধ হয়?

ব্র। ডাকাতির সমান তো সব দেখিলাম—ডাকাতি করিলে করিতে পারে, তাও দেখিলাম। তবু বিশ্বাস হয় না যে, ডাকাতি করে।

সা। তবু কেন বিশ্বাস হয় না?

ব্র। কে জানে। ডাকাতি না করিলেই বা এত ধন কোথায় পাইল?

সা। কেহ বলে, দেবী দেবতার বরে এত ধন পাইয়াছে; কেহ বলে, মাটির ভিতর পোঁতা টাকা

পাইয়াছে ; কেহ বলে, দেবী সোনা করিতে জানে।

ব্র। দেবী কী বলে ?

সা। দেবী বলে, এক কড়াও আমার নয়, সব পরের।

ব্র। পরের ধন এত পাইল কোথায় ?

সা। তা কী জানি।

ব্র। পরের ধন হলে অত আমিরি করে ? পরে কিছু বলে না ?

সা। দেবী কিছু আমিরি করে না। খুদ খায়, মাটিতে শোয়, গড়া পরে। কাল যা দেখলে, সে-সকল তোমার-আমার জন্য মাত্র—কেবল দোকানদারি। তোমার হাতে ও কী ?

সাগর ব্রজেশ্বরের আঙুলে নূতন আঙ্গটি দেখিল।

ব্রজেশ্বর বলিল, 'কাল দেবীর নৌকায় জলযোগ করিয়াছিলাম বলিয়া দেবী আমাকে এই আঙ্গটি মর্যাদা দিয়াছে।'

সা। দেখি।

ব্রজেশ্বর আঙ্গটি খুলিয়া দেখিতে দিল। সাগর হাতে লইয়া ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। বলিল, 'ইহাতে দেবী চৌধুরানির নাম লেখা আছে।'

ব্র। কই ?

সা। ভিতরে—ফারসিতে।

ব্র। (পড়িয়া) এ কী এ ? এ যে আমার নাম—আমার আঙ্গটি ? সাগর ! তোমাকে আমার দিব্য, যদি তুমি আমার কাছে সত্য কথা না কও। আমায় বল, দেবী কে ?

সা। তুমি চিনিতে পার নাই, সে কি আমার দোষ ? আমি তো একদণ্ডে চিনিয়াছিলাম।

ব্র। কে ! কে ! দেবী কে ?

সা। প্রফুল্ল।

আর ব্রজেশ্বর কথা কহিল না। সাগর দেখিল, প্রথমে ব্রজেশ্বরের শরীরে কাঁটা দিয়া উঠিল, তার পর একটা অনির্বচনীয় আহ্লাদের চিহ্ন—উচ্ছলিত সুখের তরঙ্গ শরীরে দেখা দিল। মুখ প্রভাময়, নয়ন উজ্জ্বল অথচ জলপ্লাবিত, দেহ উন্নত, কান্তি স্ফূর্তিময়ী। তার পরই আবার সাগর দেখিল, সব যেন নিবিয়া গেল ; বড় ঘোরতর বিষাদ আসিয়া যেন সেই প্রভাময় কান্তি অধিকার করিল। ব্রজেশ্বর বাক্যশূন্য, স্পন্দহীন, নিমেষশূন্য। ক্রমে সাগরের মুখপানে চাহিয়া চাহিয়া ব্রজেশ্বর চক্ষু মুদিল। দেহ অবসন্ন হইল ; ব্রজেশ্বর সাগরের কোলে মাথা রাখিয়া শুইয়া পড়িল। সাগর কাতর হইয়া অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করিল। কিছুই উত্তর পাইল না ; একবার ব্রজেশ্বর বলিল, 'প্রফুল্ল ডাকাত ! ছি !'

দশম পরিচ্ছেদ

ব্রজেশ্বর ও সাগরকে বিদায় দিয়া দেবী চৌধুরানি—হায় ! কোথায় গেল দেবী ? কই সে বেশভূষা, ঢাকাই শাড়ি, সোনাদানা, হীরা মুক্তা পান্না—সব কোথায় গেল ? দেবী সব ছাড়িয়াছে—সব একেবারে অন্তর্ধান করিয়াছে। দেবী কেবল একখানা গড়া পরিয়াছে—হাতে কেবল একগাছা কড়। দেবী নৌকার একপাশে বজরার শুধু তক্তার উপর একখানা চট পাতিয়া শয়ন করিল। ঘুমাইল কি না, জানি না।

প্রভাতে বজরা বাঞ্ছিত স্থানে আসিয়া লাগিয়াছে দেখিয়া, দেবী নদীর জলে নামিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া ভিজা কাপড়েই রহিল—সেই চটের মতো মোটা শাড়ি। কপাল ও বুক গঙ্গামৃত্তিকায় চর্চিত করিল—রুক্ষ, ভিজা চুল এলাইয়া দিল—তখন দেবীর যে সৌন্দর্য বাহির হইল, গত রাত্রির

বেশভূষা, জাঁকজমক, হীরা মোতি চাঁদনি বা রানিগিরিতে তাহা দেখা যায় নাই। কাল দেবীকে রত্নাভরণে রাজরানির মতো দেখাইতেছিল—আজ গঙ্গামৃত্তিকার সজ্জায় দেবতার মতো দেখাইতেছে। যে সুন্দর, সে মাটি ছাড়িয়া হীরা পরে কেন?

দেবী এই অনুপম বেশে একজন মাত্র স্ত্রীলোক সমভিব্যাহারে লইয়া তীরে তীরে চলিল—বজরায় উঠিল না। এরূপ অনেক দূর গিয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করিল। আমরা কথায় কথায় জঙ্গলের কথা বলিতেছি—কথায় কথায় ডাকাইতের কথা বলিতেছি—ইহাতে পাঠক মনে করিবেন না, আমরা কিছুমাত্র অত্যুক্তি করিতেছি, অথবা জঙ্গল বা ডাকাইত ভালোবাসি। যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ে সে দেশ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখনো অনেক স্থানে ভয়ানক জঙ্গল—কতক কতক আমি স্বচক্ষে দেখিয়া আসিয়াছি। আর ডাকাইতের তো কথাই নাই। পাঠকের স্মরণ থাকে যেন যে, ভারতবর্ষের ডাকাইত শাসন করিতে মার্কুইস অব হেস্টিংসকে যতবড় যুদ্ধোদ্যম করিতে হইয়াছিল, পঞ্জাবের লড়াইয়ের পূর্বে আর কখনো তত করিতে হয় নাই। এ সকল অরাজকতার সময়ে ডাকাইতিই ক্ষমতাশালী লোকের ব্যবসা ছিল। যাহারা দুর্বল বা গণ্ডমূর্খ, তাহারাই 'ভালো মানুষ' হইত। ডাকাইতিতে তখন কোনো নিন্দা বা লজ্জা ছিল না।

দেবী জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিয়াও অনেক দূর গেল। একটা গাছের তলায় পৌঁছিয়া পরিচারিকাকে বলিল, 'দিবা, তুই এখানে বস্; আমি আসিতেছি। এ বনে বাঘ-ভালুক বড় অল্প। আসিলেও তোর ভয় নাই। লোক পাহারায় আছে।' এই বলিয়া দেবী সেখান হইতে আরো গাঢ়তর জঙ্গলমধ্যে প্রবেশ করিল। অতি নিবিড় জঙ্গলের ভিতর একটা সুড়ঙ্গ। পাথরের সিঁড়ি আছে। যেখানে নামিতে হয়, সেখানে অন্ধকার—পাথরের ঘর। পূর্বকালে বোধহয় দেবালয় ছিল—এক্ষণে কাল সহকারে চারিপাশে মাটি পড়িয়া গিয়াছে। কাজেই তাহাতে নামিবার সিঁড়ি গড়িবার প্রয়োজন হইয়াছে। দেবী অন্ধকারে সিঁড়িতে নামিল।

সেই ভূগর্ভস্থ মন্দিরে মিটমিট করিয়া একটা প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তার আলোতে এক শিবলিঙ্গ দেখা গেল। এক ব্রাহ্মণ সেই শিবলিঙ্গের সম্মুখে বসিয়া তাহার পূজা করিতেছিল। দেবী শিবলিঙ্গকে প্রণাম করিয়া ব্রাহ্মণের কিছু দূরে বসিলেন। দেখিয়া ব্রাহ্মণ পূজা সমাপনপূর্বক, আচমন করিয়া দেবীর সঙ্গে কথোপকথনে প্রবৃত্ত হইলেন।

ব্রাহ্মণ বলিল, 'মা! কাল রাত্রে—তুমি কী করিয়াছ? তুমি কি ডাকাইতি করিয়াছ নাকি?'

দেবী বলিল, 'আপনার কি বিশ্বাস হয়?'

ব্রাহ্মণ বলিল, 'কী জানি!'

ব্রাহ্মণ আর কেহই নহে; আমাদের পূর্বপরিচিত ভবানী ঠাকুর।

দেবী বলিল, 'কী জানি কী, ঠাকুর? আপনি কি আমায় জানেন না? দশ বৎসর আজ এ দস্যুদলের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইলাম। লোকে জানে, যত ডাকাইতি হয়, সব আমিই করি। তথাপি একদিনের জন্য এ-কাজ আমা হইতে হয় নাই—তা আপনি বেশ জানেন। তবু বলিলেন—'কী জানি?'

ভবানী। রাগ কর কেন? আমরা যে অভিপ্রায়ে ডাকাইতি করি, তা মন্দ কাজ বলিয়া আমরা জানি না। তাহা হইলে, একদিনের তরেও ঐ কাজ করিতাম না। তুমিও এ-কাজ মন্দ মনে কর না, বোধহয়—কেননা, তাহা হইলে এ দশ বৎসর—

দেবী। সে বিষয়ে আমার মত ফিরিতেছে। আমি আপনার কথায় এতদিন ভুলিয়াছিলাম — আর ভুলিব না। পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয় তো মহাপাতক কী? আপনাদের সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধই রাখিব না।

ভবানী। সে কী! যা এতদিন বুঝাইয়া দিয়াছি, তাই কি আবার তোমায় বুঝাইতে হইবে? যদি আমি এ-সকল ডাকাইতির ধনের এক কপর্দক গ্রহণ করিতাম, তবে মহাপাতক বটে। কিন্তু তুমি তো জানো যে, কেবল পরকে দিবার জন্য ডাকাইতি করি। যে ধার্মিক, যে সৎপথে থাকিয়া ধন

উপার্জন করে, যাহার ধনহানি হইলে ভরণপোষণের কষ্ট হইবে—রঙ্গরাজ কি আমি কখনো তাহাদের এক পয়সাও লই নাই। যে জুয়াচোর, দাগাবাজ, পরের ধন কাড়িয়া বা ফাঁকি দিয়া লইয়াছে, আমরা তাহাদের উপর ডাকাইতি করি। করিয়া এক পয়সাও লই না, যাহার ধন বঞ্চকেরা লইয়াছিল, তাহাকেই ডাকিয়া দিই। এ সকল কি তুমি জানো না? দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই; যে যার পায়, কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রানি করিয়া রাজশাসন চালাইতেছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম?

দেবী। রাজা রানি, যাকে করিবেন, সেই হইতে পারিবে। আমাকে অব্যাহতি দিন—আমার এ রানিগিরিতে আর চিত্ত নাই।

ভবানী। আর কাহাকেও এ রাজ্য সাজে না। আর কাহারো অতুল ঐশ্বর্য নাই—তোমার ধনদানে সকলেই তোমার বশ।

দেবী। আমার যে ধন আছে, সকলই আমি আপনাকে দিতেছি। আমি ঐ টাকা যেরূপে খরচ করিতাম, আপনিও সেইরূপে করিবেন। আমি কাশী গিয়া বাস করিব, মানস করিয়াছি।

ভবানী। কেবল তোমার ধনেই কি সকলে তোমার বশ? তুমি রূপে যথার্থ রাজরানি—গুণে যথার্থ রাজরানি। অনেকে তোমাকে সাক্ষাৎ ভগবতী বলিয়া জানে—কেননা তুমি সন্ন্যাসিনী, মা'র মতো পরের মঙ্গল কামনা কর, অকাতরে ধন দান কর, আবার ভগবতীর মতো রূপবতী। তাই আমরা তোমার নামে এ রাজ্য শাসন করি—নহিলে আমাদের কে মানিত?

দেবী। তাই লোকে আমাকে ডাকাইতনী বলিয়া জানে—এ অখ্যাতি মরিলেও যাবে না।

ভবানী। অখ্যাতি কী? এ বরেন্দ্রভূমে আজিকালি কে এমন আছে যে, এ নামে লজ্জিত? কিন্তু সে কথা যাক—ধর্মাচরণে সুখ্যাতি অখ্যাতি খুঁজিবার দরকার কী? খ্যাতির কামনা করিলেই কর্ম আর নিষ্কাম হইল কই? তুমি যদি অখ্যাতির ভয় কর, তবে তুমি আপনার খুঁজিলে, পরের ভাবিলে না। আত্মবিসর্জন হইল কই?

দেবী। আপনাকে আমি তর্কে আঁটিয়া উঠিতে পারিব না—আপনি মহামহোপাধ্যায়—আমার স্ত্রীবুদ্ধিতে যাহা আসিতেছে, তাই বলিতেছি—আমি এ রানিগিরি হইতে অবসর হইতে চাই। আমার এ আর ভালো লাগে না।

ভবানী। যদি ভালো লাগে না—তবে কালি রঙ্গরাজকে ডাকাইতি করিতে পাঠাইয়াছিলে কেন? কথা যে আমার অবিদিত নাই, তাহা বলা বেশির ভাগ।

দেবী। কথা যদি অবিদিত নাই, তবে অবশ্য এটাও জানেন যে, কাল রঙ্গরাজ ডাকাইতি করে নাই—ডাকাইতির ভান করিয়াছিল মাত্র।

ভবানী। কেন? তা আমি জানি না, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি।

দেবী। একটা লোককে ধরিয়া আনিবার জন্য।

ভ। লোকটা কে?

দেবীর মুখে নামটা একটু বাধ-বাধ করিল—কিন্তু নাম না করিলেও নয়—ভবানীর সঙ্গে প্রতারণা চলিবে না। অতএব অগত্যা দেবী বলিল, 'তার নাম ব্রজেশ্বর রায়।'

ভ। আমি তাকে বিলক্ষণ চিনি। তাকে তোমার কী প্রয়োজন?

দেবী। কিছু দিবার প্রয়োজন ছিল। তার বাপ ইজারাদারের হাতে কয়েদ যায়। কিছু দিয়া ব্রাহ্মণের জাতিরক্ষা করিয়াছি।

ভ। ভালো কর নাই। হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড। খামখা আপনার বেহাইনের জাতি মারিয়াছিল—তার জাতি যাওয়াই ভালো ছিল।

দেবী শিহরিল। বলিল, 'সে কীরকম?'

ভ। তার একটা পুত্রবধূর কেহ ছিল না, কেবল বিধবা মা ছিল। হরবল্লভ সেই গরিবের বাগদি অপবাদ দিয়া বউটাকে বাড়ি হইতে তাড়াইয়া দিল। দুঃখে বউটার মা মরিয়া গেল।

দে। আর বউটা?

ভ। শুনিয়াছি, খাইতে না পাইয়া মরিয়া গিয়াছে।

দেবী। আমাদের সেসব কথায় কাজ কী? আমরা পরহিত-ব্রত নিয়েছি—যার দুঃখ দেখিব, তারই দুঃখ মোচন করিব।

ভ। ক্ষতি নাই। কিন্তু সম্প্রতি অনেকগুলি লোক দারিদ্র্যগ্রস্ত—ইজারাদারের দৌরাত্ম্যে সর্বস্ব গিয়াছে। এখন কিছু কিছু পাইলেই, তাহারা আহার করিয়া গায়ে বল পায়। গায়ে বল পাইলেই তাহারা লাঠিবাজি করিয়া আপন আপন স্বত্ব উদ্ধার করিতে পারে। শীঘ্র একদিন দরবার করিয়া তাহাদিগের রক্ষা কর।

দে। তবে প্রচার করুন যে, এইখানেই আগামী সোমবার দরবার হইবে।

ভ। না। এখানে আর তোমার থাকা হইবে না। ইংরেজ সন্ধান পাইয়াছে, তুমি এখন এই প্রদেশে আছ। এবার পাঁচশত সিপাহি লইয়া তোমার সন্ধানে আসিতেছে। অতএব এখানে দরবার হইবে না। বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে, প্রচার করিয়াছি। সোমবার দিন অবধারিত করিয়াছি। সে জঙ্গলে সিপাহি যাইতে সাহস করিবে না—করিলে মারা পড়িবে। ইচ্ছামতো টাকা সঙ্গে লইয়া আজি বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে যাত্রা কর।

দে। এবার চলিলাম। কিন্তু আর আমি এ কাজ করিব কি না সন্দেহ। ইহাতে আর আমার মন নাই।

এই বলিয়া দেবী উঠিল। আবার জঙ্গল ভাঙ্গিয়া বজরায় গিয়া উঠিল। বজরায় উঠিয়া রঙ্গরাজকে ডাকিয়া চুপি চুপি এই উপদেশ দিল, 'আগামী সোমবার বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে দরবার হইবে। এই দণ্ডে বজরা খোল—সেইখানেই চল—বরকন্দাজদিগের সংবাদ দাও, দেবীগড় হইয়া যাও—টাকা লইয়া যাইতে হইবে। সঙ্গে অধিক টাকা নাই।'

তখন মুহূর্তমধ্যে বজরার মস্তুলের উপর তিন-চারিখানা ছোট-বড় শাদা পাল বাতাসে ফুলিতে লাগিল; ছিপখানা বজরার সামনে আসিয়া বজরার সঙ্গে বাঁধা হইল। তাহাতে ষাটজন জোয়ান বোটে লইয়া বসিয়া, 'রানিজি-কি-জয়' বলিয়া বহিতে আরম্ভ করিল—সেই জাহাজের মতো বজরা তখন তীরবেগে ছুটিল। এদিকে দেখা গেল, বহুসংখ্যক পথিক বা হাটুরিয়া লোকের মতো লোক, নদীতীরে জঙ্গলের ভিতর দিয়া বজরার সঙ্গে দৌড়াইয়া যাইতেছে। তাহাদের হাতে কেবল এক-এক লাঠি মাত্র—কিন্তু বজরার ভিতর বিস্তর ঢাল, সড়কি, বন্দুক আছে। ইহারা দেবীর 'বরকন্দাজ' সৈন্য।

সব ঠিক দেখিয়া দেবী স্বহস্তে আপনার শাকান্ন পাকের জন্য হাঁড়িশালায় গেল। হায় দেবী! তোমার এ কীরূপ সন্ন্যাস!

একাদশ পরিচ্ছেদ

সোমবার প্রাতঃসূর্যপ্রভাসিত নিবিড় কাননাভ্যন্তরে দেবী রানির 'দরবার,' বা 'এজলাশ'। সে এজলাশে কোনো মোকদ্দমা-মামলা হইত না। রাজকার্যের মধ্যে কেবল একটা কাজ হইত—অকাতরে দান।

নিবিড় জঙ্গল—কিন্তু তাহার ভিতর প্রায় তিনশত বিঘা জমি সাফ হইয়াছে। সাফ হইয়াছে, কিন্তু বড় বড় গাছ কাটা হয় নাই—তাহার ছায়ায় লোক দাঁড়াইবে। সেই পরিষ্কার ভূমিখণ্ডে প্রায় দশ হাজার লোক জমিয়াছে—তাহারই মাঝখানে দেবী রানির এজলাশ। একটা বড় শামিয়ানা গাছের ডালে ডালে বাঁধিয়া টাঙানো হইয়াছে। তার নিচে বড় বড় মোটা মোটা রুপার ডাণ্ডার উপর একখানা কিংখাপের চাঁদোয়া টাঙানো—তাতে মোতির ঝালর। তাহার ভিতর চন্দনকাষ্ঠের বেদি।

বেদীর উপর বড় পুরু গালিচা পাতা। গালিচার উপর একখানা ছোটরকম রুপার সিংহাসন। সিংহাসনের উপর মসনদ্ পাতা—তাহাতেও মুক্তার ঝালর। দেবীর বেশভূষার আজ বিশেষ জাঁক। শাড়ি পরা। শাড়িখানায় ফুলের মাঝে মাঝে এক-একখানা হীরা। অঙ্গ রত্নে খচিত—কদাচিৎ মধ্যে মধ্যে অঙ্গের উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দেখা যাইতেছে। গলায় এত মোতির হার যে, বুকের আর বস্ত্র পর্যন্ত দেখা যায় না। মাথায় রত্নময় মুকুট। দেবী আজ শরৎকালে প্রকৃত দেবীপ্রতিমা মতো সাজিয়াছে। এসব দেবীর রানিগিরি। দুইপাশে চারিজন সুসজ্জিতা যুবতী স্বর্ণদণ্ড চামর লইয়া বাতাস দিতেছে, পাশে ও সম্মুখে বহুসংখ্যক চোপদার ও আশাবরদার বড় জাঁকের পোশাক করিয়া, বড় বড় রুপার আশা ঘাড়ে করিয়া খাড়া হইয়াছে। সকলের উপর জাঁক, বরকন্দাজের সারি। প্রায় পাঁচশত বরকন্দাজ দেবীর সিংহাসনের দুইপাশে সার দিয়া দাঁড়াইল। সকলেই সুসজ্জিত—লাল পাগড়ি, লাল আঙরাখা, লাল ধুতি মালকোঁচা মারা, পায়ে লাল নাগরা, হাতে ঢাল-সড়কি। চারিদিকে লাল নিশান পোঁতা।

দেবী সিংহাসনে আসীন হইল। সেই দশ হাজার লোকে একবার 'দেবী রানি-কি জয়' বলিয়া জয়ধ্বনি করিল। তারপর দশজন সুসজ্জিত যুবা অগ্রসর হইয়া মধুর কণ্ঠে দেবীর স্তুতিগান করিল। তারপর সেই দশসহস্র দরিদ্রের মধ্য হইতে এক-একজন করিয়া ভিক্ষার্থীদিগকে দেবীর সিংহাসনসমীপে রঙ্গরাজ আনিতে লাগিল। তাহারা সম্মুখে আসিয়া ভক্তিভাবে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। যে বয়োজ্যেষ্ঠ ও ব্রাহ্মণ, সেও প্রণাম করিল—কেননা, অনেকের বিশ্বাস ছিল যে, দেবী ভগবতীর অংশ, লোকের উদ্ধারের জন্য অবতীর্ণা। সেইজন্য কেহ কখনো তাঁর সন্ধান ইংরেজের নিকট বলিত না, অথবা তাঁহার গ্রেপ্তারির সহায়তা করিত না। দেবী সকলকে মধুর ভাষায় সম্বোধন করিয়া তাহাদের নিজ নিজ অবস্থার পরিচয় লইলেন। পরিচয় লইয়া, যাহার যেমন অবস্থা, তাহাকে সেইরূপ দান করিতে লাগিলেন। নিকটে টাকাপোরা ঘড়া সব সাজানো ছিল।

এইরূপ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত দেবী দরিদ্রগণকে দান করিলেন। সন্ধ্যা অতীত হইয়া এক প্রহর রাত্রি হইল। তখন দান শেষ হইল। তখন পর্যন্ত দেবী জলগ্রহণ করেন নাই। দেবীর ডাকাইতি এইরূপ—অন্য ডাকাইতি নাই।

কিছুদিন মধ্যে রঙ্গপুরে গুডল্যাড সাহেবের কাছে সংবাদ পৌঁছিল যে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলমধ্যে দেবী চৌধুরানির ডাকাইতের দল জমায়েৎবস্ত হইয়াছে—ডাকাইতের সংখ্যা নাই। ইহাও রটিল যে, অনেক ডাকাইত রাশি-রাশি অর্থ লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিতেছে—অতএব তাহারা অনেক ডাকাইতি করিয়াছে সন্দেহ নাই। যাহারা দেবীর নিকট দান পাইয়া অর্থ লইয়া আসিয়াছিল, তাহারা সব মুনকির—বলে, টাকা কোথা? ইহার কারণ, ভয় আছে, টাকার কথা শুনিলেই ইজারাদারের পাইক সব কাড়িয়া লইয়া যাইবে। অথচ তাহারা খরচপত্র করিতে লাগিল—সুতরাং সকল লোকেরই বিশ্বাস হইল যে, দেবী চৌধুরানি এবার ভারি রকম লুঠিতেছে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

যথাকালে পিতৃসমীপে উপস্থিত হইয়া ব্রজেশ্বর তাঁর পদবন্দনা করিলেন।

হরবল্লভ অন্যান্য কথার পর জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আসল সংবাদ কী? টাকার কী হইয়াছে?'

ব্রজেশ্বর বলিলেন যে, 'তাঁহার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই।' হরবল্লভের মাথায় বজ্রাঘাত হইল—হরবল্লভ চিৎকার করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তবে টাকা পাও নাই?'

'আমার শ্বশুর টাকা দিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু আর এক স্থানে টাকা পাইয়াছি—'

হরবল্লভ। পেয়েছ? তা আমায় এতক্ষণ বল নাই? দুর্গা, বাঁচলাম!

ব্র। টাকাটা যে-স্থানে পাইয়াছি, তাহাতে সে গ্রহণ করা উচিত কি না, বলা যায় না।

হর। কে দিল?

ব্রজেশ্বর অধোবদনে মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে বলিল, 'তার নামটা মনে আস্‌চে না—সেই যে মেয়ে-ডাকাইত একজন আছে!'

হর। কে, দেবী চৌধুরানি?

ব্র। সেই।

হর। তার কাছে টাকা পাইলে কী প্রকারে?

ব্রজেশ্বরের প্রাচীন নীতিশাস্ত্রে লেখে যে, এখানে বাপের কাছে ভাঁড়াভাঁড়িতে দোষ নাই। ব্রজ বলিল, 'ও টাকাটা একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে।'

হর। বদ্ লোকের টাকা! লেখাপড়া কীরকম হইয়াছে?

ব্র। একটু সুযোগে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া লেখাপড়া করিতে হয় নাই।

বাপ আর এ বিষয়ে বেশি খোঁচাখুঁচি করিয়া জিজ্ঞাসা না করে, এ অভিপ্রায়ে ব্রজেশ্বর তখনই কথাটা চাপা দিয়া বলিল, 'পাপের ধন যে গ্রহণ করে, সেও পাপের ভাগী হয়। তাই ও টাকাটা লওয়া আমার তেমন মত নয়।'

হরবল্লভ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, 'টাকাটা নেব না তো ফাটকে যাব নাকি? টাকা ধার নেব, তার আবার পাপের টাকা পুণ্যের টাকা কী? আর জপতপের টাকাই বা কার কাছে পাব? সে আপত্তি করে কাজ নাই। কিন্তু আসল আপত্তি এই যে, ডাকাইতের টাকা, তাতে আবার লেখাপড়া করে নাই—ভয় হয়, পাছে দেরি হলে বাড়িঘর লুঠপাট করিয়া লইয়া যায়।'

ব্রজেশ্বর চুপ করিয়া রহিল।

হর। তা টাকার মিয়াদ কত দিন?

ব্র। আগামী বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমীর চন্দ্রাস্ত পর্যন্ত।

হর। তা সে হল ডাকাইত। দেখা দেয় না। কোথা তার দেখা পাওয়া যাবে যে, টাকা পাঠাইয়া দিব?

ব্র। ঐদিন সন্ধ্যার পর সে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে বজরায় থাকিবে। সেইখানে টাকা পৌঁছাইলেই হইবে।

হরবল্লভ বলিলেন, 'তা সেই দিন সেইখানেই টাকা পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে।'

ব্রজেশ্বর বিদায় হইলেন। হরবল্লভ তখন মনে মনে বুদ্ধি খাটাইয়া কথাটা ভালো করিয়া বিচার করিয়া দেখিলেন। শেষে স্থির করিলেন, 'হাঃ, সে বেটির আবার টাকা শোধ দিতে যাবে! বেটিকে সিপাহি এনে ধরিয়ে দিলেই সব গোল মিটে যাবে। বৈশাখী সপ্তমীর দিন সন্ধ্যার পর কাপ্তেন সাহেব পল্টনসুদ্ধ তার বজরায় না উঠে—তো আমার নাম হরবল্লভই নয়। তাকে আর আমার কাছে টাকা নিতে হবে না।'

হরবল্লভ এই পুণ্যময় অভিসন্ধিটা আপনার মনে মনেই রাখিলেন—ব্রজেশ্বরকে বিশ্বাস করিয়া বলিলেন না।

এদিকে সাগর আসিয়া ব্রহ্মঠাকুরানির কাছে গিয়া গল্প করিল যে, ব্রজেশ্বর একটা রাজরানির বজরায় গিয়া, তাকে বিবাহ করিয়া আসিয়াছে—সাগর অনেক মানা করিয়াছিল, তাহা শুনে নাই। মাগী জেতে কৈবর্ত—আর তার দুইটা বিবাহ আছে—সুতরাং ব্রজেশ্বরের জাতি গিয়াছে, সুতরাং সাগর আর ব্রজেশ্বরের পাত্রাবশিষ্ট ভোজন করিবে না, ইহা স্থির প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। ব্রহ্মঠাকুরানি এ সকল কথা ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করায় ব্রজেশ্বর অপরাধ স্বীকার করিয়া বলিল, 'রানিজি জাত্যংশে ভালো—আমার পিতৃঠাকুরের পিসি হয়। আর বিয়ে—তা আমারও তিনটা, তারও তিনটা।'

ব্রহ্মঠাকুরানি বুঝিল, কথাটা মিথ্যা ; কিন্তু সাগরের মতলব যে, ব্রহ্মঠাকুরানি এ গল্পটা নয়নতারার কাছে করে। সে বিষয়ে তিলার্ধ বিলম্ব হইল না। নয়নতারা একে সাগরকে দেখিয়া

জ্বলিয়াছিল, আবার শুনিল যে, স্বামী একটা বুড়ো কন্যে বিবাহ করিয়াছে। নয়নতারা একেবারে আগুনের মতো জ্বলিয়া উঠিল। সুতরাং কিছুদিন ব্রজেশ্বর নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারিলেন না—সাগরের ইজারা-মহল হইয়া রহিলেন।

সাগরের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইল। কিন্তু নয়নতারা বড় গোল বাধাইল—শেষে গিন্নির কাছে গিয়া নালিশ করিল। গিন্নি বলিলেন, 'তুমি বাছা পাগল মেয়ে। বামুনের ছেলে কি কৈবর্ত বিয়ে করে গা? তোমাকে সবাই খেপায়, তুমিও খ্যাপো।'

নয়ান-বৌ তবু বুঝিল না। বলিল, 'যদি সত্য সত্যই বিয়ে হয়ে থাকে?' গিন্নি বলিলেন, 'যদি সত্যই হয়, তবে বৌ বরণ করে ঘরে তুলব। বেটার বৌ তো আর ফেলতে পারব না।'

এই সময়ে ব্রজেশ্বর আসিল, নয়ান-বৌ অবশ্য পলাইয়া গেল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, 'মা, কী বলছিলে গা?'

গিন্নি বলিলেন, 'এই বলছিলাম যে, তুই যদি আবার বিয়ে করিস, তবে আবার বৌ বরণ করে ঘরে তুলি।'

ব্রজেশ্বর অন্যমনা হইল, কিছু উত্তর না করিয়া চলিয়া গেল।

প্রদোষকালে গিন্নি ঠাকুরানি কর্তামহাশয়কে বাতাস করিতে করিতে, ভর্তৃচরণে এই কথা নিবেদন করিলেন। কর্তা জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার মনটা কী?'

গিন্নি। আমি ভাবি কী যে, সাগর-বৌ ঘর করে না। নয়ান-বৌ ছেলের যোগ্য বৌ নয়। তা যদি একটি ভালো দেখে ব্রজ বিয়ে করে সংসার-ধর্ম করে, আমার সুখ হয়।

কর্তা। তা ছেলের যদি সেরকম বোঝ, তা আমায় বলিও। আমি ঘটক ডেকে ভালো দেখে সম্বন্ধ করব।

গিন্নি। আচ্ছা, আমি মন বুঝিয়া দেখিব।

মন বুঝিবার ভার ব্রহ্মঠাকুরানির উপর পড়িল। ব্রহ্মঠাকুরানি অনেক বিরহসন্তপ্ত এবং বিবাহ-প্রয়াসী রাজপুত্রের উপকথা ব্রজকে শুনাইলেন, কিন্তু ব্রজের মন তাহাতে কিছু বোঝা গেল না। তখন ব্রহ্মঠাকুরানি স্পষ্ট জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। কিছুই খবর পাইলেন না। ব্রজেশ্বর কেবল বলিল, 'বাপ-মা যে আজ্ঞা করিবেন, আমি তাই পালন করিব।'

কথাটার আর বড় উচ্চবাচ্য হইল না।

তৃতীয় খণ্ড

প্রথম পরিচ্ছেদ

বৈশাখী শুক্লা সপ্তমী আসিল, কিন্তু দেবী রানির ঋণ পরিশোধের কোনো উদ্যোগ হইল না। হরবল্লভ এক্ষণে অঋণী, মনে করিলে অনায়াসে অর্থসংগ্রহ করিয়া দেবীর ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেন, কিন্তু সেদিকে মন দিলেন না। তাঁহাকে এ-বিষয়ে নিতান্ত নিশ্চেষ্ট দেখিয়া ব্রজেশ্বর দুই-চারিবার এ-কথা উত্থাপন করিলেন, কিন্তু হরবল্লভ তাঁহাকে স্তোকবাক্যে নিবৃত্ত করিলেন। এদিকে বৈশাখ মাসের শুক্লা সপ্তমী প্রায়াগতা—দুই-চারিদিন আছে মাত্র। তখন ব্রজেশ্বর পিতাকে টাকার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। হরবল্লভ বলিলেন, 'ভালো, ব্যস্ত হইও না। আমি টাকার সন্ধানে চলিলাম। ষষ্ঠীর দিন ফিরিব।' হরবল্লভ শিবিকারোহণে পাচক ব্রাহ্মণ, ভৃত্য ও দুইজন লাঠিয়াল (পাইক) সঙ্গে লইয়া গৃহ হইতে যাত্রা করিলেন।

হরবল্লভ টাকার চেষ্টায় গেলেন বটে, কিন্তু সে আর একরকম। তিনি বরাবর রঙ্গপুর গিয়া কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। তখন কালেক্টরই শান্তিরক্ষক ছিলেন। হরবল্লভ তাঁহাকে বলিলেন, 'আমার সঙ্গে সিপাহি দিউন, আমি দেবী চৌধুরানিকে ধরাইয়া দিব। ধরাইয়া দিতে পারিলে আমাকে কী পুরস্কার দিবেন বলুন।'

শুনিয়া সাহেব আনন্দিত হইলেন। তিনি জানিতেন যে, দেবী চৌধুরানি দস্যুদিগের নেত্রী। তাহাকে ধরিতে পারিলে আর-আর সকলে ধরা পড়িবে। তিনি দেবীকে ধরিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন, কোনোমতে সফল হইতে পারেন নাই। অতএব হরবল্লভ সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসীকে ধরাইয়া দিবে শুনিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন। পুরস্কার দিতে স্বীকৃত হইলেন। হরবল্লভ বলিলেন, 'আমার সঙ্গে পাঁচশত সিপাহি পাঠাইতে হুকুম হউক।' সাহেব সিপাহির হুকুম দিলেন। হরবল্লভকে সঙ্গে করিয়া লেফটেনান্ট ব্রেনান সিপাহি লইয়া দেবীকে ধরিতে চলিলেন।

হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের নিকট সবিশেষ শুনিয়াছিলেন, ঠিক সে ঘাটে দেবীকে পাওয়া যাইবে। সম্ভবত দেবী বজরাতেই থাকিবে। লেফটেনান্ট ব্রেনান সেইজন্য কতক ফৌজ লইয়া ছিপে চলিলেন। এইরূপ পাঁচখানি ছিপ ভাঁটি দিয়া দেবীর বজরা ঘেরাও করিতে চলিল। এদিকে লেফটেনান্ট সাহেব আর কতক সিপাহি সৈন্য লুক্কায়িতভাবে, বন দিয়া বন দিয়া তটপথে পাঠাইলেন। যেখানে দেবীর বজরা থাকিবে, হরবল্লভ বলিয়া দিল ; সেইখানে তীরবর্তী বনমধ্যে ফৌজ লুকাইয়া রাখিলেন, যদি দেবী ছিপের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তটপথে পলাইবার চেষ্টা করে, তবে তাহাকে এই ফৌজের দ্বারা ঘেরাও করিয়া ধরিবেন। আরো এক পলাইবার পথ ছিল—ছিপগুলি ভাঁটি দিয়া আসিবে, দূর হইতে ছিপ দেখিতে পাইলে দেবী ভাঁটি দিয়া পলাইতে পারে, অতএব লেফটেনান্ট ব্রেনান অবশিষ্ট সিপাহিগুলিকে দুই ক্রোশ ভাঁটিতে পাঠাইলেন, তাহাদিগের থাকিবার জন্য এমন একটি স্থান নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন যে, সেখানে ত্রিস্রোতা নদী এই শুকার সময়ে সহজে হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সিপাহিরা সেখানে তীরে লুকাইয়া থাকিবে, বজরা দেখিলেই জলে আসিয়া তাহা ঘেরাও করিবে।

সন্ন্যাসিনী রমণীকে ধরিবার জন্য এইরূপ ঘোরতর আড়ম্বর হইল। কিন্তু কর্তৃপক্ষেরা এ আড়ম্বর নিষ্প্রয়োজন মনে করেন নাই। দেবী সন্ন্যাসিনী হউক আর নাই হউক, তাহার আজ্ঞাধীন হাজার যোদ্ধা আছে, সাহেবেরা জানিতেন। এই যোদ্ধাদিগের নাম 'বরকন্দাজ'। অনেক সময়ে কোম্পানির সিপাহিদিগকে এই বরকন্দাজদিগের লাঠির চোটে পলাইতে হইয়াছিল, এইরূপ প্রবাদ। হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বাঁশের বংশে বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন

কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল-খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়! বন্দুক আর সঙিন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে। যোদ্ধা ভাঙা হাত লইয়া পলাইয়াছে। লাঠি! তুমি বাঙ্গালায় আব্রু পরদা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জ্বালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। তুমি তখনকার পিনাল কোড ছিলে—তুমি পিনাল কোডের মতো দুষ্টের দমন করিতে, পিনাল কোডের মতো শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পিনাল কোডের মতো রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙিতে। তবে পিনাল কোডের উপর তোমার এই সরদারি ছিল যে, তোমার উপর আপিল চলিত না। হায়! এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে! পিনাল কোড তোমাকে তাড়াইয়া তোমার আসন গ্রহণ করিয়াছে—সমাজ-শাসন-ভার তোমার হাত হইতে তার হাতে গিয়াছে। তুমি লাঠি! আর লাঠি নও, বংশদণ্ড মাত্র! ছড়িত্ব প্রাপ্ত হইয়া শৃগাল-কুক্কুর-ভীত বাবুবর্গের হাতে শোভা কর; কুক্কুর ডাকিলেই সে ননীর হাতগুলি হইতে খসিয়া পড়। তোমার সে মহিমা আর নাই। শুনিতে পাই, সেকালে তুমি নাকি উত্তম ঔষধ ছিলে—মানসিক ব্যাধির উত্তম চিকিৎসকদিগের মুখে শুনিতে পাই, 'মূর্খস্য লাঠ্যৌষধং।' এখন মূর্খের ঔষধ 'বাপু' 'বাছা'—তাহাতেও রোগ ভালো হয় না। তোমার সগোত্র সপিণ্ডগণের মধ্যে অনেকেরই গুণ এই দুনিয়াতে জাজ্জ্বল্যমান। ইস্তক আড়া বাঁকারি খুঁটি খোঁটা লাগায়েৎ শ্রীনন্দনন্দনের মোহন বংশী, সকলেরই গুণ বুঝি—কিন্তু লাঠি! তোমার মতো কেহ না। তুমি আর নাই—গিয়াছ। ভরসা করি, তোমার অক্ষয় স্বর্গ হইয়াছে; তুমি ইন্দ্রলোকে গিয়া নন্দনকাননের পুষ্পভারাবনত পারিজাত-বৃক্ষশাখার ঠেকনা হইয়া আছ, দেবকন্যারা তোমার ঘায় কল্পবৃক্ষ হইতে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ ফল-সকল পাড়িয়া লইতেছে। এক-আধটা ফল যেন পৃথিবীতে গড়াইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

যার লাঠির ভয়ে এত সিপাহির সমাগম, তার কাছে একখানি লাঠিও ছিল না। নিকটে একটি লাঠিয়ালও ছিল না। দেবী সেই ঘাটে—যে ঘাটে বজরা বাঁধিয়া ব্রজেশ্বরকে বন্দি করিয়া আনিয়াছিল, সেই ঘাটে। সবে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। সেই বজরা তেমনই সাজানো—সব ঠিক সেরকম নয়। সে ছিপখানি সেখানে নাই—তাহাতে যে পঞ্চাশজন লাঠিয়াল ছিল, তাহারা নাই। তারপর বজরার উপরেও একটি পুরুষমানুষ নাই—মাঝি মাল্লা, রঙ্গরাজ প্রভৃতি কেহ নাই। কিন্তু বজরার মাস্তুল উঠানো—চারিখানা পাল তোলা আছে—বাতাসের অভাবে পাল মাস্তুলে জড়ানো পড়িয়া আছে। বজরার নোঙরও ফেলা নহে, কেবল দুগাছা কাছিতে তীরে খোঁটায় বাঁধা আছে।

তৃতীয়, দেবী নিজে তেমন রত্নাভরণভূষিতা মহার্ঘবস্ত্রপরিহিতা নয়, কিন্তু আর এক প্রকারে শোভা আছে। ললাটে, গণ্ড, বাহু, হৃদয়, সর্বাঙ্গ সুগন্ধি চন্দনে চর্চিত; চন্দনচর্চিত ললাট বেষ্টন করিয়া সুগন্ধি পুষ্পের মালা শিরোদেশের বিশেষ শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে। হাতে ফুলের বালা। অন্য অলঙ্কার একখানিও নাই। পরনে সেই মোটা শাড়ি।

আর, আজ দেবী একা ছাদের উপর বসিয়া নহে, কাছে আর দুইজন স্ত্রীলোক বসিয়া। একজন নিশি, অপর দিবা। এই তিনজনে যে-কথাটা হইতেছিল, তাহার মাঝখানে হইতে বলিলেও ক্ষতি নাই।

দিবা বলিতেছিল—দিবা অশিক্ষিতা, ইহা পাঠকের স্মরণ রাখা উচিত—বলিতেছিল, 'হাঁঃ, পরমেশ্বরকে নাকি আবার প্রত্যক্ষ দেখা যায়?'

প্রফুল্ল বলিল, 'না, প্রত্যক্ষ দেখা যায় না। কিন্তু আমি প্রত্যক্ষ দেখার কথা বলিতেছিলাম না—আমি প্রত্যক্ষ করার কথা বলিতেছিলাম। প্রত্যক্ষ ছয় রকম। তুমি যে প্রত্যক্ষ দেখার কথা কহিতেছিলে, সে চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ—চক্ষের প্রত্যক্ষ। আমার গলার আওয়াজ তুমি শুনিতে পাইতেছ—আমার গলার আওয়াজ তোমার শ্রবণ প্রত্যক্ষ, অর্থাৎ কানের প্রত্যক্ষের বিষয় হইতেছে। আমার হাতের ফুলের গন্ধ

তোমার নাকে যাইতেছে কি?'

দিবা। যাইতেছে।

দেবী। ওটা তোমার ঘ্রাণজ প্রত্যক্ষ হইতেছে। আর আমি যদি তোমার গালে এক চড় মারি, তাহা হইলে তুমি আমার হাতকে প্রত্যক্ষ করিবে—সেটা ত্বাচ প্রত্যক্ষ। আর এখনি নিশি যদি তোমার মাথা খায়, তাহা হইলে, তোমার মগজটা তার রাসন প্রত্যক্ষ হইবে।

দিবা। মন্দ প্রত্যক্ষ হইবে না। কিন্তু পরমেশ্বরকে দেখাও যায় না, শোনাও যায় না, শোঁকাও যায় না, ছোঁয়াও যায় না, খাওয়াও যায় না। তাঁকে প্রত্যক্ষ করিব কী প্রকারে?

নিশি। এ তো গেল পাঁচ রকম প্রত্যক্ষ। ছয় রকম প্রত্যক্ষের কথা বলিয়াছি ; কেননা, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, রসনা ও ত্বক ছাড়া আর একটা জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে, জানো না?

দিবা : কী, দাঁত?

নিশি : দূর্ হ পোড়ারমুখী! ইচ্ছা করে, কিল মেরে তোর সে ইন্দ্রিয়ের পাটিকে পাটি ভেঙে দিই।

দেবী। (হাসিতে হাসিতে) চক্ষুরাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; হস্তপদাদি পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়, আর ইন্দ্রিয়াধিপতি মনঃ উভয়েন্দ্রিয় অর্থাৎ মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বটে, কর্মেন্দ্রিয়ও বটে। মনঃ জ্ঞানেন্দ্রিয় বলিয়া মনের দ্বারাও প্রত্যক্ষ আছে। ইহাকে মানস প্রত্যক্ষ বলে। ঈশ্বর মানস প্রত্যক্ষের বিষয়।

নিশি। 'ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ—প্রমাণাভাবাৎ।'

যিনি সাংখ্যপ্রবচনসূত্র ও ভাষ্য পড়িয়াছেন, তিনি নিশির এই ব্যঙ্গোক্তির মর্ম বুঝিবেন। নিশি প্রফুল্লের একপ্রকার সহাধ্যায়িনী ছিল।

প্রফুল্ল উত্তর করিল, 'সূত্রকারস্যোভয়েন্দ্রিয়শূন্যত্বাৎ—ন তু প্রমাণাভাবাৎ।'

দিবা। রেখে দাও তোমার হাবাৎ মবাৎ—আমি তো পরমেশ্বরকে কখনো মনের ভিতর দেখিতে পাই নাই।

প্রফুল্ল। আবার দেখা। চাক্ষুষপ্রত্যক্ষই দেখা—অন্য কোনো প্রত্যক্ষ দেখা নয়—মানস প্রত্যক্ষও দেখা নয়। চাক্ষুষ প্রত্যক্ষের বিষয়—রূপ, বহির্বিষয় ; মানস প্রত্যক্ষের বিষয়—অন্তর্বিষয়। মনের দ্বারা ঈশ্বর প্রত্যক্ষ হইতে পারেন। ঈশ্বরকে দেখা যায় না।

দিবা। কই? আমি তো ঈশ্বরকে কখনো মনের ভিতর কোনোরকম প্রত্যক্ষ করি নাই?

প্রফুল্ল। মানুষের স্বাভাবিক প্রত্যক্ষশক্তি অল্প—সাহায্য বা অবলম্বন ব্যতীত সকল বস্তু প্রত্যক্ষ করিতে পারে না।

দিবা। প্রত্যক্ষের জন্য আবার সাহায্য কীরকম? দেখ, এই নদী, জল, গাছপালা, নক্ষত্র, সকলই আমি বিনা সাহায্যে দেখিতে পাইতেছি।

'সকলই নয়। ইহার একটি উদাহরণ দিব?' বলিয়া প্রফুল্ল হাসিল।

হাসির রকমটা দেখিয়া নিশি জিজ্ঞাসা করিল, 'কী?'

প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, 'ইংরেজের সিপাহি আমাকে আজ ধরিতে আসিতেছে জানো?'

দিবা দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিল, 'তা তো জানি।'

প্রফুল্ল। সিপাহি প্রত্যক্ষ করিয়াছ?

দিবা। না। কিন্তু আসিলে প্রত্যক্ষ করিব।

প্র। আমি বলিতেছি—আসিয়াছে, কিন্তু বিনা সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছি না। এই সাহায্য গ্রহণ কর।

এই বলিয়া প্রফুল্ল দিবার হাতে দূরবীক্ষণ দিল। ঠিক যেদিকে দেখিতে হইবে, দেখাইয়া দিল। দিবা দেখিল।

দেবী জিজ্ঞাসা করিল, 'কী দেখিলে?'

দিবা। একখানা ছিপ। উহাতে অনেক মানুষ দেখিতেছি বটে।

দেবী। উহাতে সিপাহি আছে। আর একখানা দেখ।

এরূপে দেবী দিবাকে পাঁচখানা ছিপ নানাস্থানে দেখাইল। নিশিও দেখিল। নিশি জিজ্ঞাসা করিল,

ছিপগুলি চরে লাগাইয়া আছে দেখিতেছি। আমাদের ধরিতে আসিয়াছে, কিন্তু আমাদের কাছে না আসিয়া ছিপ তীরে লাগাইয়া আছে কেন?'

দেবী। বোধহয়, ডাঙা–পথে যে–সকল সিপাহি আসিবে, তাহারা আসিয়া পৌঁছে নাই। ছিপের সিপাহি তাহাদের অপেক্ষায় আছে। ডাঙার সিপাহি আসিবার আগে, ছিপের সিপাহি আগু হইলে, আমি ডাঙা–পথে পলাইতে পারি, এই শঙ্কায় উহারা আগু হইতেছে না।

দিবা। কিন্তু আমরা তো উহাদের দেখিতে পাইতেছি; মনে করিলেই তো পলাইতে পারি।

দেবী। ওরা তা জানে না। ওরা জানে না যে, আমরা দূরবীন রাখি।

নিশি। ভগিনি! প্রাণে বাঁচিলে এক দিন–না–একদিন স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবেক। আজ ডাঙায় উঠিয়া প্রাণরক্ষা করিবে চল। এখনো যদি ডাঙায় সিপাহি আসে নাই, তবে ডাঙা–পথে এখনো প্রাণরক্ষার উপায় আছে।

দেবী। যদি প্রাণের জন্য আমি এত কাতর হইব, তবে আমি সকল সংবাদ জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলাম কেন? আসিলাম যদি, তবে লোকজন সবাইকে বিদায় দিলাম কেন? আমার হাজার বরকন্দাজ আছে—তাহাদের সকলকে অন্য স্থানে পাঠাইলাম কেন?

দিবা। আমরা আগে যদি জানিতাম, তাহা হইলে তোমায় এমন কর্ম করিতে দিতাম না।

দেবী। তোমরা সাধ্য কী, দিবা! যা আমি স্থির করিয়াছি, তা অবশ্য করিব। আজ স্বামীদর্শন করিব, স্বামীর অনুমতি লইয়া জন্মান্তরে তাঁহাকে কামনা করিয়া প্রাণ সমর্পণ করিব। তোমরা আমার কথা শুনিও, দিবা নিশি! আমার স্বামী যখন ফিরিয়া যাইবেন, তখন তাঁহার নৌকায় উঠিয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইও। আমি একা ধরা দিব, আমি একা ফাঁসি যাব। সেইজন্যই বজরা হইতে আর সকলকে বিদায় দিয়াছি। তোমরা তখন গেলে না। কিন্তু আমায় এই ভিক্ষা দাও—আমার স্বামীর নৌকায় উঠিয়া পলায়ন করিও।

নিশি। ধড়ে প্রাণ থাকিতে তোমায় ছাড়িব না। মরিতে হয়, একত্র মরিব।

প্র। ও সকল কথা এখন থাক্—যাহা বলিতেছিলাম, তা বলিয়া শেষ করি। যাহা চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছিলে না, তা যেমন দূরবীক্ষণের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করিলে; তেমন ঈশ্বরকে মানস প্রত্যক্ষ করিতে দূরবীন চাই।

দিবা। মনের আবার দূরবীন কী?

প্র। যোগ।

দিবা। কী—সেই ন্যাস, প্রাণায়াম, কুম্ভক, বুজরুকি, ভেলকি—

প্র। তাকে আমি যোগ বলি না। যোগ অভ্যাস মাত্র। কিন্তু সকল অভ্যাসই যোগ নয়। তুমি যদি দুধ ঘি খাইতে অভ্যাস কর, তাকে যোগ বলিব না। তিনটি অভ্যাসকেই যোগ বলি।

দিবা। কী কী তিনটি?

প্র। জ্ঞান, কর্ম, ভক্তি। জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ।

ততক্ষণ নিশি দূরবীন লইয়া এদিক ওদিক দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বলিল, 'সম্প্রতি উপস্থিত গোলযোগ।'

প্র। সে আবার কী? আবার গোলযোগ কী?

নিশি। একখানা পানসি আসিতেছে। বুঝি ইংরেজের চর।

প্রফুল্ল নিশির হাত হইতে দূরবীন লইয়া পানসি দেখিল। বলিল, 'এই আমার সুযোগ। তিনিই আসিতেছেন। তোমরা নিচে যাও।'

দিবা ও নিশি ছাদ হইতে নামিয়া কামরার ভিতর গেল। পানসি ক্রমে বাহিয়া আসিয়া বজরার গায়ে লাগিল। সেই পানসিতে—ব্রজেশ্বর। ব্রজেশ্বর, লাফাইয়া বজরায় উঠিয়া, পানসি তফাতে বাঁধিয়া রাখিতে হুকুম দিলেন। পানসিঅলা তাহাই করিল।

ব্রজেশ্বর নিকটে আসিলে, প্রফুল্ল উঠিয়া দাঁড়াইয়া আনত মস্তকে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। পরে উভয়ে বসিলে, ব্রজেশ্বর বলিল, 'আজ টাকা আনিতে পারি নাই, দুই–চারি দিনে দিতে পারিব বোধহয়।

দুই-চারি দিনের পরে কবে কোথায় তোমার সঙ্গে দেখা হইবে, সেটা জানা চাই।'

ও ছি! ছি! ব্রজেশ্বর! দশ বছরের পর প্রফুল্লের সঙ্গে এই কী কথা!

দেবী উত্তর করিল, 'আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হইবে না—' বলিতে বলিতে দেবীর গলাটা বুজিয়া আসিল—দেবী একবার চোখ মুছিল—'আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না, কিন্তু আমার ঋণ শুধিবার অন্য উপায় আছে। যখন সুবিধা হইবে, ঐ টাকা গরিব-দুঃখীকে বিলাইয়া দিবেন—তাহা হইলে আমি পাইব।'

ব্রজেশ্বর দেবীর হাত ধরিল। বলিল, 'প্রফুল্ল! তোমার টাকা—'

ছাই টাকা! কথা শেষ হইল না—মুখের কথা মুখে রহিল। যেমন ব্রজেশ্বর 'প্রফুল্ল' বলিয়া ডাকিয়া হাত ধরিয়াছে, অমনি প্রফুল্লের দশ বছরের বাঁধা বাঁধ ভাঙিয়া, চোখের জলের স্রোত ছুটিল। ব্রজেশ্বরের ছাই টাকার কথা সে স্রোতে কোথায় ভাসিয়া গেল। তেজস্বিনী দেবী রানি ছেলেমানুষের মতো বড় কান্নাটা কাঁদিল। ব্রজেশ্বর ততক্ষণ বড় বিপন্ন হইলেন। তাঁর মনে মনে বোধ আছে যে—এ পাপীয়সী, ডাকাইতি করিয়া খায়, এর জন্য একফোঁটাও চোখের জল ফেলা হবে না। কিন্তু চোখের জল, অত বিধিব্যবস্থা অবগত নয়, তারা অনাহূত আসায় ব্রজেশ্বরের চোখ ভরিয়া গেল। ব্রজেশ্বর মনে করিলেন, হাত উঠাইয়া চোখ মুছিলেই ধরা পড়িব। কাজেই চোখ মোছা হইল না। চোখ মোছা হইল না, তখন পুকুর ছাপাইয়া—গাল বাহিয়া ধারা চলিল—প্রফুল্লের হাতে পড়িল।

তখন বালির বাঁধটা ভাঙিয়া গেল! ব্রজেশ্বর মনে করিয়া আসিয়াছিলেন যে, প্রফুল্লকে ডাকাইতি করার জন্য ভারি রকম তিরস্কার করিবেন, পাপীয়সী বলিবেন—আরো দুই-চারিটা লম্বা-চৌড়া কথা বলিয়া আবার একবার জন্মের মতো ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কিন্তু কেঁদে যার হাত ভিজিয়ে দিবেন, তার উপর কি আর লম্বা-চৌড়া কথা হয়?

তখন চক্ষু মুছিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, 'দেখ প্রফুল্ল, তোমার টাকা আমার টাকা—তার পরিশোধের জন্য আমি কেন কাতর হব? কিন্তু আমি বড় কাতরই হইয়াছি। আমি আজ দশ বৎসর কেবল তোমাকেই ভাবিয়াছি। আমার আর দুই স্ত্রী আছে—আমি তাহাদিগকে এ দশ বৎসর স্ত্রী মনে করি নাই; তোমাকেই স্ত্রী জানি। কেন, তা বুঝি তোমায় আমি বুঝাইতে পারিব না। শুনিয়াছিলাম, তুমি নাই। কিন্তু আমার পক্ষে তুমি ছিলে। আমি তার পরও মনে জানিতাম, তুমিই আমার স্ত্রী—মনে আর কাহারো স্থান ছিল না। বলব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু বলাতেও ক্ষতি নাই—তুমি মরিয়াছ শুনিয়া, আমিও মরিতে বসিয়াছিলাম। এখন মনে হয়, মরিলেই ভালো হইত; তুমি মরিলে ভালো হইত—না মরিয়াছিলে তো আমি মরিলেই ভালো হইত। এখন যাহা শুনিয়াছি, বুঝিয়াছি, তা শুনিতে হইত না, বুঝিতে হইত না। আজ দশ বৎসরের হারানো ধন তোমায় পাইয়াছি, আমার স্বর্গসুখের অপেক্ষা অধিক সুখ হইত। তা না হয়ে প্রফুল্ল, আজ তোমায় পাইয়া মর্মান্তিক যন্ত্রণা।' তারপর একবার থামিয়া একটু ঢোক গিলিয়া, মাথা টিপিয়া ধরিয়া ব্রজেশ্বর বলিল, 'মনের মন্দিরের ভিতর সোনার প্রতিমা গড়িয়া রাখিয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্ল —মুখে আসে না—সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি!'

প্রফুল্ল বলিল, 'কী? ডাকাইতি করি?'

ব্র। কর নাকি?

ইহার উত্তরে প্রফুল্ল একটা কথা বলিতে পারিত। যখন ব্রজেশ্বরের পিতা প্রফুল্লকে জন্মের মতো ত্যাগ করিয়া গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দেয়, তখন প্রফুল্ল কাতর হইয়া শ্বশুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, 'আমি অন্নের কাঙাল, তোমরা তাড়াইয়া দিলে—আমি কী করিয়া খাইব?' তাহাতে শ্বশুর উত্তর দিয়াছিলেন, 'চুরি ডাকাইতি করিয়া খাইও।' প্রফুল্ল মেধাবিনী—সে কথা ভুলে নাই। ভুলিবার কথাও নহে। আজ ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে ডাকাইত বলিয়া এই ভর্ৎসনা করিল; আজ প্রফুল্লের সেই উত্তর ছিল। প্রফুল্লের এই উত্তর ছিল, 'আমি ডাকাইত বটে—তা এখন এত ভর্ৎসনা কেন? তোমরাই তো চুরি-ডাকাইতি করিয়া খাইতে বলিয়াছিলে। আমি গুরুজনের আজ্ঞা পালন করিতেছি।' এ উত্তর সম্বরণ করাই যথার্থ পুণ্য। প্রফুল্ল সে পুণ্য সঞ্চয় করিল—সে কথা মুখেও আনিল না। প্রফুল্ল স্বামীর কাছে হাতজোড় করিয়া এই উত্তর দিল; বলিল, 'আমি ডাকাইত নই। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি, আমি কখনো ডাকাইতি করি নাই। কখনো ডাকাইতির এক কড়া লই নাই। তুমি আমার দেবতা। আমি অন্য দেবতার

অর্চনা করিতে শিখিতেছিলাম—শিখিতে পারি নাই; তুমি সব দেবতার স্থান অধিকার করিয়াছ—তুমিই একমাত্র আমার দেবতা। আমি তোমার কাছে শপথ করিতেছি—আমি ডাকাইত নই। তবে জানি, লোকে আমাকে ডাকাইত বলে। কেন বলে, তাও জানি। সেই কথা তোমাকে আমার কাছে শুনিতে হইবে। সেই কথা শুনাইব বলিয়াই আজ এখান আসিয়াছি। আজ না শুনিলে, আর শুনা হইবে না। শোন, আমি বলি।'

তখন যেদিন প্রফুল্ল শ্বশুরালয় হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিল, সেইদিন হইতে আজ পর্যন্ত আপনার কাহিনী সকলই অকপটে বলিল। শুনিয়া ব্রজেশ্বর বিস্মিত, লজ্জিত, অতিশয় আহ্লাদিত, আর মহামহিমময়ী স্ত্রীর সমীপে কিছু ভীত হইলেন। প্রফুল্ল সমাপন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার একথাগুলিতে বিশ্বাস করিলে কি?'

অবিশ্বাসের জায়গা ছিল না—প্রফুল্লের প্রতি কথা ব্রজেশ্বরের হাড়ে হাড়ে বসিয়াছিল। ব্রজেশ্বর উত্তর করিতে পারিল না—কিন্তু তাহার আনন্দপূর্ণ কান্তি দেখিয়া প্রফুল্ল বুঝিল, বিশ্বাস হইয়াছে। তখন প্রফুল্ল বলিতে লাগিল, 'এখন পায়ের ধূলা দিয়া এ জন্মের মতো আমায় বিদায় দাও। আর এখানে বিলম্ব করিও না—সম্মুখে কোনো বিঘ্ন আছে। তোমায় এই দশ বৎসরের পর পাইয়া এখনই উপযাচিকা হইয়া বিদায় দিতেছি; ইহাতে বুঝিবে যে, বিঘ্ন বড় সামান্য নহে। আমার দুইটি সখী এই নৌকায় আছে। তাহারা বড় গুণবতী, আমিও তাহাদের বড় ভালোবাসি। তোমার নৌকায় তাহাদের লইয়া যাও। বাড়ি পৌঁছিয়া, তারা যেখানে যাইতে চায়, সেইখানে পাঠাইয়া দিও। আমায় যেমন মনে রাখিয়াছিলে, তেমনি মনে রাখিও। সাগর যেন আমায় না ভুলে।'

ব্রজেশ্বর ক্ষণেক কাল নীরবে ভাবিল। পরে বলিল, 'আমি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, প্রফুল্ল! আমায় বুঝাইয়া দাও। তোমার এত লোক—কেহ নাই! বজরার মাঝিরা পর্যন্ত নাই! কেবল দুইটি স্ত্রীলোক আছে, তাদেরও বিদায় করিতে চাহিতেছ। সম্মুখে বিঘ্ন বলিতেছ—আমাকে থাকিতে নিষেধ করিতেছ। আর এ জন্মে সাক্ষাৎ হইবে না বলিতেছ। এসব কী? সম্মুখে কী বিঘ্ন আমাকে না বলিলে, আমি যাইব না। বিঘ্ন কী, শুনিলেও যাইব কিনা, তাও বলিতে পারি না।'

প্রফুল্ল। সে-সব কথা তোমার শুনিবার নয়।

ব্র। তবে আমি কি তোমার কেহ নই?

এমন সময় দুম করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দুম করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল—ব্রজেশ্বরের মুখের কথা মুখে রহিল, দুইজনে চমকিয়া সম্মুখে চাহিয়া দেখিল। দেখিল,—দূরে পাঁচখানা ছিপ আসিতেছে, বটিয়ার তাড়নে জল চাঁদের আলোয় জ্বলিতেছে। দেখিতে দেখিতে দেখা গেল, পাঁচখানা ছিপ সিপাহি-ভরা। ডাঙা-পথের সিপাহিরা আসিয়া পৌঁছিয়াছে, তারই সঙ্কেত বন্দুকের শব্দ। শুনিয়াই পাঁচখানা ছিপ খুলিয়াছিল। দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, 'আর তিলার্ধ বিলম্ব করিও না। শীঘ্র আপনার পানসিতে উঠিয়া চলিয়া যাও।'

ব্র। কেন? এ ছিপগুলো কিসের? বন্দুক কিসের?

প্র। না শুনিলে যাইবে না?

ব্র। কোনোমতেই না।

প্র। এ ছিপে কোম্পানির সিপাহি আছে। এ বন্দুক ডাঙা হইতে কোম্পানির সিপাহি আওয়াজ করিল।

ব্র। কেন এত সিপাহি এদিকে আসিতেছে? তোমাকে ধরিবার জন্য?

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার কথায় বোধ হইতেছে, তুমি পূর্ব হইতে এই সংবাদ জানিতে?'

প্র। জানিতাম—আমার চর সর্বত্র আছে।

ব্র। এ ঘাটে আসিয়া জানিয়াছ, না আগে জানিয়াছ?

প্র। আগে জানিয়াছিলাম।

ব্র। তবে, জানিয়া শুনিয়া এখানে আসিলে কেন?

প্র। তোমাকে আর একবার দেখিব বলিয়া।

ব্র। তোমার লোকজন কোথায়?

প্র। বিদায় দিয়াছি। তারা কেন আমার জন্য মরিবে?

ব্র। নিশ্চিত ধরা দিবে, স্থির করিয়াছ?

প্র। আর বাঁচিয়া কী হইবে? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালোবাস, তাহা শুনিলাম। আমার যে কিছু ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি। আর এখন বাঁচিয়া কোন্ কাজ করিব বা কোন্ সাধ মিটাইব? আর বাঁচিব কেন?

ব্র। বাঁচিয়া, আমার ঘরে গিয়া, আমার ঘর করিবে।

প্র। সত্য বলিতেছ?

ব্র। তুমি আমার কাছে শপথ করিয়াছ, আমিও তোমার কাছে শপথ করিতেছি। আজ যদি তুমি প্রাণ রাখো, আমি তোমাকে আমার ঘরণী গৃহিণী করিব।

প্র। আমার শ্বশুর কী বলিবেন?

ব্র। আমার বাপের সঙ্গে আমি বোঝাপড়া করিব।

প্র। হায়! এ কথা কাল শুনি নাই কেন?

ব্র। কাল শুনিলে কী হইত?

প্র। তাহা হইলে কার সাধ্য আজ আমায় ধরে?

ব্র। এখন?

প্র। এখন আর উপায় নাই। তোমার পানসি ডাকো—নিশী ও দিবাকে লইয়া শীঘ্র যাও।

ব্রজেশ্বর আপনার পানসি ডাকিল। পানসিঅলা নিকটে আসিলে ব্রজেশ্বর বলিল 'তোরা শীঘ্র পলা, ঐ কোম্পানির সিপাহির ছিপ আসিতেছে; তোদের দেখিলে উহারা বেগার ধরিবে। শীঘ্র পলা, আমি যাইব না, এইখানে থাকিব।'

পানসির মাঝি মহাশয়, আর দ্বিরুক্তি না করিয়া তৎক্ষণাৎ পানসি খুলিয়া প্রস্থান করিলেন। ব্রজেশ্বর চেনা লোক, টাকার ভাবনা নাই।

পানসি চলিয়া গেল দেখিয়া প্রফুল্ল বলিল, 'তুমি গেলে না?'

ব্র। কেন, তুমি মরিতে জানো, আমি জানি না? তুমি আমার স্ত্রী—আমি তোমায় শতবার ত্যাগ করিতে পারি। কিন্তু আমি তোমার স্বামী—বিপদে আমিই ধর্মত তোমার রক্ষাকর্তা। আমি রক্ষা করিতে পারিব না—তাই বলিয়া কি বিপদ্‌কালে তোমাকে ত্যাগ করিয়া যাইব?

'তবে কাজেই আমি স্বীকার করিলাম, প্রাণরক্ষার যদি কোনো উপায় হয়, তা আমি করিব।' এই বলিতে বলিতে প্রফুল্ল আকাশপ্রান্তে দৃষ্টিপাত করিল। যাহা দেখিল, তাহাতে যেন কিছু ভরসা হইল। আবার তখনই নির্ভরসা হইয়া বলিল, 'কিন্তু আমার প্রাণরক্ষায় আর এক অমঙ্গল আছে।'

ব্র। কী?

প্র। এ-কথা তোমায় বলিব না মনে করিয়াছিলাম, কিন্তু এখন আর না বলিলে নয়। এই সিপাহিদের সঙ্গে আমার শ্বশুর আছেন। আমি ধরা না পড়িলে তাঁর বিপদ্ ঘটিলেও ঘটিতে পারে।

ব্রজেশ্বর শিহরিল—মাথায় করাঘাত করিল। বলিল, 'তিনিই কি গোইন্দা?'

প্রফুল্ল চুপ করিয়া রহিল। ব্রজেশ্বরের বুঝিতে কিছু বাকি রহিল না। এখানে আজিকার রাত্রে যে দেবী চৌধুরানির সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে, এ-কথা হরবল্লভ ব্রজেশ্বরের কাছে শুনিয়াছিলেন। ব্রজেশ্বর আর কাহারো কাছে এ-কথা বলেন নাই; দেবীর যে গূঢ় মন্ত্রণা, আর কাহারো জানিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ দেবী এ ঘাটে আসিবার আগেই কোম্পানির সিপাহি রঙ্গপুরে হইতে যাত্রা করিয়াছিল। সন্দেহ

নাই; নহিলে ইহারই মধ্যে পৌঁছিত না। আর ইতিপূর্বেই হরবল্লভ কোথায় যাইতেছেন, কাহারো কাছে প্রকাশ না করিয়া দূরযাত্রা করিয়াছেন, আজও ফেরেন নাই—কথাটা বুঝিতে দেরি হইল না। তাই হরবল্লভ টাকা পরিশোধের কোনো উদ্যোগ করেন নাই, তথাপি ব্রজেশ্বর ভুলিলেন না যে,

'পিতা ধর্মঃ পিতা স্বর্গঃ পিতাহি পরমন্তপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রীয়ন্তে সর্বদেবতাঃ॥'

ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে বলিলেন, 'আমি মরি কোনো ক্ষতি নাই। তুমি মরিলে, আমার মরার অধিক হইবে, কিন্তু আমি দেখিতে আসিব না। তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।'

প্র। সেজন্য চিন্তা নাই। আমার রক্ষা হইবে না, অতএব তাঁর কোনো ভয় নাই। তিনি তোমায় রক্ষা করিলে করিতে পারিবেন। তবে ইহাও তোমার মনস্তুষ্টির জন্য আমি স্বীকার করিতেছি যে, তাঁর অমঙ্গল সম্ভাবনা থাকিতে আমি আত্মরক্ষার কোনো উপায় করিব না। তুমি বলিলেও করিতাম না, না বলিলেও করিতাম না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকিও।

এই কথা দেবী আন্তরিক বলিয়াছিল। হরবল্লভ প্রফুল্লের সর্বনাশ করিয়াছিল, হরবল্লভ এখন দেবীর সর্বনাশ করিতে নিযুক্ত। তবু দেবী তাঁর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিণী। কেননা, প্রফুল্ল নিষ্কাম। যার ধর্ম নিষ্কাম, সে কার মঙ্গল খুঁজিলাম, তত্ত্ব রাখে না। মঙ্গল হইলেই হইল।

কিন্তু এ সময়ে তীরবর্তী অরণ্যমধ্য হইতে গভীর তূর্যধ্বনি হইল। দুইজনেই চমকিয়া উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দেবী ডাকিল, 'নিশি?'

নিশি ছাদের উপর আসিল।

দেবী। কার ভেরি ঐ?

নিশি। যেন দাড়ি বাবাজির বলিয়া বোধ হয়।

দেবী। রঙ্গরাজের?

নিশি। সেই রকম।

দেবী। সে কী! আমি রঙ্গরাজকে প্রাতে দেবীগড় পাঠাইয়াছি।

নিশি। বোধহয়, পথ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছে।

দেবী। রঙ্গরাজকে ডাকো।

ব্রজেশ্বর বলিল, 'ভেরির আওয়াজ অনেক দূর হইতে হইয়াছে। এখান হইতে ডাকিলে ডাক শুনিতে পাইবে না। আমি নামিয়া গিয়া ভেরিওয়ালাকে খুঁজিয়া আনিতেছি।'

দেবী বলিল, 'কিছু করিতে হইবে না। তুমি একটু নিচে গিয়া নিশির কৌশল দেখ।'

নিশি ও ব্রজ নিচে আসিল। নিশি নিচে গিয়া এক বাঁশি বাহির করিল। নিশি গীতবাদ্যে বড় পটু, সে শিক্ষাটা রাজবাড়িতে হইয়াছিল। নিশিই দেবীর বীণার ওস্তাদ। নিশি বাঁশিতে ফুঁ দিয়া মল্লারে তান মারিল। অনতিবিলম্বে রঙ্গরাজ বজরায় আসিয়া উঠিয়া দেবীকে আশীর্বাদ করিল।

এই সময়ে ব্রজেশ্বর নিশিকে বলিল, 'তুমি ছাদে যাও। তোমার কাছে কেহ বোধহয়, কথা লুকাইবে না। কী কথা হয়, শুনিয়া আসিয়া আমাকে সব বলিও।'

নিশি স্বীকৃত হইয়া কামরার বাহির হইল—বাহির হইয়া আবার ফিরিয়া আসিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, 'আপনি একটু বাহিরে আসিয়া দেখুন।'

ব্রজেশ্বর মুখ বাড়াইয়া দেখিল। দেখিতে পাইল, জঙ্গলের ভিতর হইতে অগণিত মনুষ্য বাহির হইতেছে। নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'উহারা কারা? সিপাই?'

নিশি বলিল, 'বোধহয় উহারা বরকন্দাজ। রঙ্গরাজ আনিয়া থাকিবে।'

দেবীও সেই মনুষ্যশ্রেণী দেখিতেছিল, এমন সময়ে রঙ্গরাজ আসিয়া আশীর্বাদ করিল। দেবী জিজ্ঞাসা করিল, তুমি এখানে কেন রঙ্গরাজ?'

রঙ্গরাজ প্রথমে কোনো উত্তর করিল না। দেবী পুনরপি বলিল, 'আমি সকালে তোমাকে দেবীগড় পাঠাইয়াছিলাম। সেখানে যাও নাই কেন? আমার কথা অমান্য করিয়াছ কেন?'

রঙ্গ। আমি দেবীগড় যাইতেছিলাম—পথে ঠাকুরজির সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল।

দেবী। ভবানী ঠাকুর?

রঙ্গ। তাঁর কাছে শুনিলাম, কোম্পানির সিপাহি আপনাকে ধরিতে আসিতেছে। তাই আমরা দুইজনে বরকন্দাজ সংগ্রহ করিয়া লইয়া আসিয়াছি। বরকন্দাজ জঙ্গলে লুকাইয়া রাখিয়া আমি তীরে বসিয়াছিলাম। ছিপ আসিতেছে দেখিয়া আমি ভেরি বাজাইয়া সঙ্কেত করিয়াছি।

দেবী। ও জঙ্গলেও সিপাহি আছে?

রঙ্গ। তাহাদের আমরা ঘেরিয়া ফেলিয়াছি।

দেবী। ঠাকুরজি কোথায়?

রঙ্গ। ঐ বরকন্দাজ লইয়া বাহির হইতেছেন।

দেবী। তোমরা কত বরকন্দাজ আনিয়াছ?

রঙ্গ। প্রায় হাজার হইবে।

দেবী। সিপাহি কত?

রঙ্গ। শুনিয়াছি পাঁচশো।

দেবী। এই পনেরোশো লোকের লড়াই হইলে, মরিবে কত?

রঙ্গ। তা দুই-চারি শো মরিলেও মরিতে পারে।

দেবী। ঠাকুরজিকে গিয়া বল—তুমিও শোন যে, তোমাদের এই আচরণে আমি আজ মর্মান্তিক মনঃপীড়া পাইলাম।

রঙ্গ। কেন, মা?

দেবী। একটা মেয়েমানুষের প্রাণের জন্য এত লোক তোমরা মারিবার বাসনা করিয়াছ—তোমাদের কি কিছু ধর্মজ্ঞান নাই? আমার পরমায়ু শেষ হইয়া থাকে, আমি একা মরিব—আমার জন্য চারি শো লোক কেন মরিবে? আমায় কি তোমরা এমন অপদার্থ ভাবিয়াছ যে, আমি এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিয়া আপনার প্রাণ বাঁচাইব?

রঙ্গ। আপনি বাঁচিলে অনেক লোকের প্রাণরক্ষা হইবে।

দেবী রাগে, ঘৃণায় অধীর হইয়া বলিল, 'ছি!' সেই ধিক্কারে রঙ্গরাজ অধোবদন হইল—মনে করিল, 'পৃথিবী দ্বিধা হউক, আমি প্রবেশ করি।'

দেবী তখন বিস্ফারিত নয়নে, ঘৃণাস্ফুরিত কম্পিতাধারে বলিতে লাগিল, 'শোন, রঙ্গরাজ! ঠাকুরজিকে গিয়া বল, এই মুহূর্তে বরকন্দাজ সকল ফিরাইয়া লইয়া যাউন। তিলার্ধ বিলম্ব হইলে, আমি এই জলে ঝাঁপ দিয়া মরিব, তোমরা কেহ রাখিতে পারিবে না।'

রঙ্গরাজ এতটুকু হইয়া গেল। বলিল, 'আমি চলিলাম। ঠাকুরজিকে এই সকল কথা জানাইব। তিনি যাহা ভালো বুঝিবেন, তাহা করিবেন। আমি উভয়েরই আজ্ঞাকারী।'

রঙ্গরাজ চলিয়া গেল। নিশি ছাদে দাঁড়াইয়া সব শুনিয়াছিল। রঙ্গরাজ গেলে, সে দেবীকে বলিল, 'ভালো, তোমার প্রাণ লইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা করিতে পার, কাহারো নিষেধ করিবার অধিকার নাই। কিন্তু আজ তোমার সঙ্গে তোমার স্বামী—তাঁর জন্যও ভাবিলে না?'

দেবী। ভাবিয়াছি ভগিনী! ভাবিয়া কিছু করিতে পারি নাই। জগদীশ্বর মাত্র ভরসা। যা হইবার, হইবে। কিন্তু যাই হউক নিশি—এক কথা সার। আমার স্বামীর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য এত লোকের প্রাণ নষ্ট করিবার আমার কোনো অধিকার নাই। আমার স্বামী আমার বড় আদরের—তাদের কে?

নিশি মনে মনে দেবীকে ধন্য ধন্য বলিল। ভাবিল, 'এই সার্থক নিষ্কাম ধর্ম শিখিয়াছিল। ইহার সঙ্গে মরিয়াও সুখ।'

নিশি গিয়া, সকল কথা ব্রজেশ্বরকে শুনাইল। ব্রজেশ্বর প্রফুল্লকে আর আপনার স্ত্রী বলিয়া ভাবিতে পারিল না; মনে মনে বলিল, 'যথার্থ দেবীই বটে। আমি নরাধম! আমি আবার ইহাকে ডাকাইত বলিয়া ভর্ৎসনা করিতে গিয়াছিলাম।'

এদিকে পাঁচ দিক হইতে পাঁচখানা ছিপ আসিয়া বজরার অতি নিকটবর্তী হইল। প্রফুল্ল সেদিকে দৃক্‌পাত করিল না, প্রস্তরময়ী মূর্তির মতো নিস্পন্দ শরীরে ছাদের উপরে বসিয়া রহিল। প্রফুল্ল ছিপ দেখিতেছিল না, বরকন্দাজ দেখিতেছিল না—দূর আকাশপ্রান্তে তাহার দৃষ্টি। আকাশপ্রান্তে একখানা ছোট মেঘ, অনেকক্ষণ হইতে দেখা দিয়াছিল—প্রফুল্ল তাই দেখিতেছিল। দেখিতে দেখিতে বোধ হইল, যেন সেখানা একটু বাড়িল; তখন 'জয় জগদীশ্বর!' বলিয়া প্রফুল্ল ছাদ হইতে নামিল।

প্রফুল্লকে ভিতরে আসিতে দেখিয়া, নিশি জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন কী করিবে?'

প্রফুল্ল বলিল, 'আমার স্বামীকে বাঁচাইব।'

নিশি। আর তুমি?

দেবী। আমার কথা আর জিজ্ঞাসা করিও না। আমি যাহা বলি, যাহা করি, এখন তাহাতে বড় সাবধানে মনোযোগ দাও। তোমার আমার অদৃষ্টে যাই হৌক, আমার স্বামীকে বাঁচাইতে হইবে, দিবাকে বাঁচাইতে হইবে, শ্বশুরকে বাঁচাইতে হইবে।

এই বলিয়া দেবী একটা শাঁক লইয়া ফুঁ দিল। নিশি বলিল, 'তবু ভালো।'

দেবী বলিল, 'ভালো কি মন্দ, বিবেচনা করিয়া দেখ। যাহা যাহা করিতে হইবে, তোমাকে বলিয়া দিতেছি। তোমার উপর সব নির্ভর।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পিপীলিকাশ্রেণীবৎ বরকন্দাজের দল ত্রিস্রোতার তীর-বন সকল হইতে বাহির হইতে লাগিল। মাথায় লাল পাগড়ি, মালকোঁচা মারা, খালি পা—জলে লড়াই করিতে হইবে বলিয়া কেহ জুতা আনে নাই। সবার হাতে ঢাল-সড়কি—কাহারো কাহারো বন্দুক আছে—কিন্তু বন্দুকের ভাগ অল্প। সকলেরই পিঠে লাঠি বাঁধা—এই বাঙ্গালার জাতীয় হাতিয়ার। বাঙালি ইহার প্রকৃত ব্যবহার জানিত; লাঠি ছাড়িয়াই বাঙালি নির্জীব হইয়াছে।

বরকন্দাজেরা দেখিল, ছিপগুলি প্রায় আসিয়া পড়িয়াছে—বজরা ঘেরিবে! বরকন্দাজ দৌড়াইল—'রানিজি-কি-জয়' বলিয়া তাহারাও বজরা ঘেরিতে চলিল। তাহারা আসিয়া আগে বজরা ঘেরিল—ছিপ তাহাদের ঘেরিল। আর যে-সময়ে শাঁক বাজিল, ঠিক সেই সময়ে জন-কত বরকন্দাজ আসিয়া বজরার উপর উঠিল। তাহারা বজরার মাঝি-মাল্লা—নৌকার কাজ করে, আবশ্যকমতো লাঠি-সড়কিও চালায়। তাহারা আপাতত লড়াইয়ে প্রবৃত্ত হইবার কোনো ইচ্ছা দেখাইল না। দাঁড়ে হালে, পালের রশি ধরিয়া, লগি ধরিয়া, যাহার যে স্থান, সেইখানে বসিল। আরো অনেক বরকন্দাজ বজরায় উপর উঠিল। তিন-চারি শো বরকন্দাজ তীরে রহিল—সেইখান হইতে ছিপের উপর সড়কি চালাইতে লাগিল। কতক সিপাহি ছিপ হইতে নামিয়া, বন্দুকে সঙিন চড়াইয়া তাহাদের আক্রমণ করিল। যে বরকন্দাজেরা বজরা ঘেরিয়া দাঁড়াইয়াছিল, অবশিষ্ট সিপাহিরা তাহাদের উপর পড়িল। সর্বত্র হাতাহাতি লড়াই হইতে লাগিল। তখন মারামারি, কাটাকাটি, চেঁচামেচি, বন্দুকের হুড়মুড়, লাঠির ঠকঠকি, ভারি হুলস্থূল পড়িয়া গেল; কেহ কাহারো কথা শুনিতে পায় না—কেহ কোনো স্থানে স্থির হইতে পারে না।

দূর হইতে লড়াই হইলে সিপাহির কাছে লাঠিয়ালেরা অধিকক্ষণ টিকিত না—কেননা, দূরে লাঠি চলে না। কিন্তু ছিপের উপর থাকিতে হওয়ায় সিপাহিদের বড় অসুবিধা হইল। যাহারা তীরে উঠিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, সে সিপাহিরা লাঠিয়ালদিগকে সঙিনের মুখে হটাইতে লাগিল; কিন্তু যাহারা জলে লড়াই করিতেছিল, তাহারা বরকন্দাজদিগের লাঠি-সড়কিতে হাত পা মাথা ভাঙিয়া কাবু হইতে লাগিল।

প্রফুল্ল নিচে আসিবার অল্পমাত্র পরেই এই ব্যাপার আরম্ভ হইল। প্রফুল্ল মনে করিল, 'হয় ভবানী

ঠাকুরের কাছে আমার কথা পৌঁছে নাই—নয় তিনি আমার কথা রাখিলেন না; মনে করিয়াছেন, আমি মরিতে পারিব না। ভালো, আমার কাজটাই তিনি দেখুন।'

দেবীর রানিগিরিতে গুটিকতক চমৎকার গুণ জন্মিয়াছিল। তার একটি এই যে, যে-সামগ্রীর কোনোপ্রকার প্রয়োজন হইতে পারে, তাহা আগে গুছাইয়া হাতের কাছে রাখিতেন। এ গুণের পরিচয় অনেক পাওয়া গিয়াছে। দেবী এখন হাতের কাছেই পাইলেন—একটি সাদা নিশান। শাদা নিশানটি বাহিরে লইয়া গিয়া স্বহস্তে উঁচু করিয়া ধরিলেন।

সেই নিশান দেখিবামাত্র লড়াই একেবারে বন্ধ হইল। যে যেখানে ছিল, সে সেইখানেই হাতিয়ার ধরিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ঝড়-তুফান যেন হঠাৎ থামিয়া গেল, প্রমত্ত সাগর যেন অকস্মাৎ প্রশান্ত হ্রদে পরিণত হইল।

দেবী দেখিল, পাশে ব্রজেশ্বর। এই যুদ্ধের সময়ে দেবীকে বাহিরে আসিতে দেখিয়া, ব্রজেশ্বরও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। দেবী তাঁহাকে বলিল, 'তুমি এই নিশান এইরূপ ধরিয়া থাকো, আমি ভিতরে গিয়া নিশি ও দিবার সঙ্গে একটা পরামর্শ আঁটিব। রঙ্গরাজ যদি এখানে আসে, তাহাকে বলিও, সে দরওয়াজা হইতে আমার হুকুম লয়।'

এই বলিয়া দেবী ব্রজেশ্বরের হাতে নিশান দিয়া চলিয়া গেল। ব্রজেশ্বর নিশান তুলিয়া ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ইতিমধ্যে সেখানে রঙ্গরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। রঙ্গরাজ ব্রজেশ্বরের হাতে শাদা নিশান দেখিয়া, চোখ ঘুরাইয়া বলিল, 'তুমি কার হুকুমে শাদা নিশান দেখাইলে?'

ব্রজ। রানিজির হুকুম।

রঙ্গ। রানিজির হুকুম? তুমি কে?

ব্রজ। চিনিতে পার না?

রঙ্গরাজ একটু নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, 'চিনিয়াছি। তুমি ব্রজেশ্বরবাবু? এখানে কী মনে করে? বাপ-বেটায় এক কাজে নাকি? কেহ একে বাঁধো।'

রঙ্গরাজের ধারণা হইল যে, হরবল্লভের ন্যায় দেবীকে ধরাইয়া দিবার জন্যই ব্রজেশ্বর কোনো ছলে বজরায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আজ্ঞা পাইয়া দুইজন ব্রজেশ্বরকে বাঁধিতে আসিল। ব্রজেশ্বর কোনো আপত্তি করিলেন না; বলিলেন, 'আমায় বাঁধো, তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু একটা কথা বুঝাইয়া দাও। শাদা নিশান দেখিয়াই দুই দলে যুদ্ধ বন্ধ করিল কেন?'

রঙ্গরাজ বলিল, 'কচি খোকা আর কী! জানো না, শাদা নিশান দেখাইলে ইংরেজের আর যুদ্ধ করিতে নাই?'

ব্র। তা আমি জানিতাম না। তা আমি জানিয়াই করি, আর না-জানিয়াই করি, রানিজির হুকুমমতো শাদা নিশান দেখাইয়াছি কি না, তুমি নাহয় জিজ্ঞাসা করিয়া আইস। আর তোমারও আজ্ঞা আছে যে, তুমি দরওয়াজা হইতে রানিজির হুকুম লইবে।

রঙ্গরাজ বরাবর কামরার দরজায় গেল। কামরার দরওয়াজা বন্ধ আছে দেখিয়া বাহির হইতে ডাকিল, 'রানি মা!'

ভিতর হইতে উত্তর, 'কে রঙ্গরাজ?'

রঙ্গ। আজ্ঞা হাঁ—একটা শাদা নিশান আমাদের বজরা হইতে দেখানো হইয়াছে—লড়াই সেইজন্য বন্ধ আছে।

ভিতর হইতে—'সে আমারই হুকুমমতো হইয়াছে। এখন তুমি ঐ শাদা নিশান লইয়া লেফটেনান্ট সাহেবের কাছে যাও। গিয়া বল যে, লড়াইয়ে প্রয়োজন নাই, আমি ধরা দিব।'

রঙ্গ। আমার শরীর থাকিতে তাহা কিছুতেই হইবে না।

দেবী। শরীরপাত করিয়াও আমায় রক্ষা করিতে পারিবে না।

রঙ্গ। তথাপি শরীরপাত করিব।

দেবী। শোন, মূর্খের মতো গোল করিও না। তোমরা প্রাণ দিয়া আমায় বাঁচাইতে পারিবে না—এ সিপাহির বন্দুকের কাছে লাঠিসোঁটা কী করিবে?

রঙ্গ। কী না করিবে ?

দেবী। যাই করুক—আর একবিন্দু রক্তপাত হইবার আগে আমি প্রাণ দিব—বাহিরে গিয়া গুলির মুখে দাঁড়াইব—রাখিতে পারিবে না। বরং এখন আমি ধরা দিলে, পলাইবার ভরসা রহিল। বরং এক্ষণে আপন আপন প্রাণ রাখিয়া সুবিধামতো যাহাতে আমি বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারি, সে চেষ্টা করিও। আমার অনেক টাকা আছে। কোম্পানির লোক সকল অর্থের বশ—আমার পলাইবার ভাবনা কি ?

দেবী মুহূর্ত জন্যও মনে করেন নাই যে, ঘুস দিয়া তিনি পলাইবেন। সেরকম পলাইবার ইচ্ছাও ছিল না। এ কেবল রঙ্গরাজকে ভুলাইতেছিলেন। তাঁর মনের ভিতর যে গভীর কৌশল উদ্ভাবিত হইয়াছিল, রঙ্গরাজের বুঝিবার সাধ্য ছিল না—সুতরাং রঙ্গরাজকে তাহা বুঝাইলেন না। সরলভাবে ইংরেজকে ধরা দিবেন, ইহা স্থির করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে, ইংরেজ আপনার বুদ্ধিতে সব খোয়াইবে। ইহাও স্থির করিয়াছিলেন যে, শত্রুর কোনো অনিষ্ট করিবেন না, বরং শত্রুকে সতর্ক করিয়া দিবেন। তবে স্বামী, শ্বশুর, সখীদিগের উদ্ধারের জন্য যাহা অবশ্যকর্তব্য তাহাও করিবেন ; যাহা যাহা হইবে, দেবী যেন দর্পণের ভিতর সকল দেখিতে পাইতেছিলেন।

রঙ্গরাজ বলিল, 'যাহা দিয়া কোম্পানির লোক বশ করিবেন তাহা তো বজরাতেই আছে। আপনি ধরা দিলে, ইংরেজ বজরাও লইবে।'

দেবী। সেইটে নিষেধ করিও। বলিও যে, আমি ধরা দিব, কিন্তু বজরা দিব না ; বজরায় যাহা আছে, তাহার কিছুই দিব না ; বজরায় যাহারা আছে, তাহাদের কাহাকেও তিনি ধরিতে পারিবেন না। এই নিয়মে আমি ধরা দিতে রাজি।

রঙ্গ। ইংরেজ যদি না শুনে, যদি বজরা লুঠিতে আসে।

দেবী। বারণ করিও—বজরায় না আসে, বজরা না স্পর্শ করে। বলিও যে, তাহা করিলে ইংরেজের বিপদ্ ঘটিবে। বজরায় আসিলে আমি ধরা দিব না। যে মুহূর্তে ইংরেজ বজরায় উঠিবে, সেই দণ্ডে আবার যুদ্ধ আরম্ভ জানিবেন। আমার কথায় তিনি স্বীকৃত হইলে, তাঁহাদের কাহাকে এখানে আসিতে হইবে না। আমি নিজে তাঁহার ছিপে যাইব।

রঙ্গরাজ বুঝিল, ভিতরে একটা কী গভীর কৌশল আছে। দৌত্যে স্বীকৃত হইল। তখন দেবী তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'ভবানী ঠাকুর কোথায় ?'

রঙ্গ। তিনি তীরে বরকন্দাজ লইয়া যুদ্ধ করিতেছেন। আমার কথা শোনেন নাই। বোধ করি, এখনো সেইখানে আছেন।

দেবী। আগে তাঁর কাছে যাও। সব বরকন্দাজ লইয়া নদীর তীরে তীরে স্বস্থানে যাইতে বল। বলিও যে, আমার বজরার লোকগুলি রাখিয়া গেলেই যথেষ্ট হইবে। আর বলিও যে, আমার রক্ষার জন্য আর যুদ্ধের প্রয়োজন নাই—আমার রক্ষার জন্য ভগবান উপায় করিয়াছেন। ইহাতে যদি তিনি আপত্তি করেন, আকাশপানে চাহিয়া দেখিতে বলিও—তিনি বুঝিতে পারিবেন।

রঙ্গরাজ তখন স্বয়ং আকাশপানে চাহিয়া দেখিল—দেখিল, বৈশাখী নবীন নীরদমালায় গগন অন্ধকার হইয়াছে।

রঙ্গরাজ বলিল, 'মা ! আর একটা আজ্ঞার প্রার্থনা করি। হরবল্লভ রায় আজিকার গোইন্দা। তার ছেলে ব্রজেশ্বরকে নৌকায় দেখিলাম। অভিপ্রায়টা মন্দ, সন্দেহ নাই। তাহাকে বাঁধিয়া রাখিতে চাহি।'

শুনিয়া নিশি ও দিবা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। দেবী বলিল, 'বাঁধিও না। এখন গোপনে ছাদের উপর বসিয়া থাকিতে বল। পরে যখন দিবা নামিতে হুকুম দিবে, তখন নামিবেন।'

আজ্ঞামতো রঙ্গরাজ আগে ব্রজেশ্বরকে ছাদে বসাইল। তারপর ভবানী ঠাকুরের কাছে গেল, এবং দেবী যাহা বলিতে বলিয়াছিলেন, তাহা বলিল। রঙ্গরাজ মেঘ দেখাইল—ভবানী দেখিল। ভবানী আর আপত্তি না করিয়া, তীরের ও জলের বরকন্দাজ সকল জমা করিয়া লইয়া ত্রিস্রোতার তীরে তীরে স্বস্থানে যাইবার উদ্যোগ করিল।

এদিকে দিবা ও নিশি, এই অবসরে বাহিরে আসিয়া, বরকন্দাজবেশী দাঁড়ী-মাঝিদিগকে চুপি চুপি কী বলিয়া গেল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এদিকে ভবানী ঠাকুরকে বিদায় দিয়া, রঙ্গরাজ শাদা নিশান হাতে করিয়া, জলে নামিয়া লেফটেনান্ট সাহেবের ছিপে গিয়া উঠিল। শাদা নিশান হাতে দেখিয়া কেহ কিছু বলিল না। সে ছিপে উঠিলে সাহেব তাহাকে বলিলেন, 'তোমরা শাদা নিশান দেখাইয়াছ, ধরা দিবে?'

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব কী! যাঁহাকে ধরিতে আসিয়াছেন, তিনিই ধরা দিবেন, সেই কথা বলিতে আসিয়াছি।

সাহেব। দেবী চৌধুরানি ধরা দিবেন?

রঙ্গ। দিবেন। তাই বলিতে আমাকে পাঠাইয়াছেন।

সা। আর তোমরা?

রঙ্গ। আমরা কারা?

সা। দেবী চৌধুরানির দল।

রঙ্গ। আমরা ধরা দিব না।

সা। আমি দলসুদ্ধ ধরিতে আসিয়াছি।

রঙ্গ। এই দল কারা? কী প্রকারে এই হাজার বরকন্দাজের মধ্যে দল বেদল চিনিবেন?

যখন রঙ্গরাজ এই কথা বলিল, তখন ভবানী ঠাকুর বরকন্দাজ সৈন্য লইয়া চলিয়া যান নাই। যাইবার উদ্যোগ করিতেছেন। সাহেব বলিল, 'এই হাজার বরকন্দাজ সবাই ডাকাইত ; কেননা, উহারা ডাকাইতের হইয়া সরকারের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেছে।'

রঙ্গরাজ। উহারা যুদ্ধ করিবে না, চলিয়া যাইতেছে দেখুন।

সাহেব দেখিলেন, বরকন্দাজ সৈন্য পলাইবার উদ্যোগ করিতেছে। সাহেব তর্জনগর্জন করিয়া বলিলেন, 'কী! তোমরা শাদা নিশানের ভান করিয়া পলাইতেছ?'

রঙ্গরাজ। সাহেব, ধরিলে কবে যে পলাইলাম? এখনো কেহ পলায় নাই। পার, ধর। শাদা নিশান ফেলিয়া দিতেছি।

এই বলিয়া রঙ্গরাজ শাদা নিশান ফেলিয়া দিল। কিন্তু সিপাহিরা সাহেবের আজ্ঞা না পাইয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল।

সাহেব ভাবিতেছিলেন, 'উহাদের পশ্চাদ্ধাবিত হওয়া বৃথা। পিছু ছুটিতে ছুটিতে উহারা নিবিড় জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিবে। একে রাত্রিকাল, তাহাতে মেঘাড়ম্বর, জঙ্গলে ঘোর অন্ধকার সন্দেহ নাই। আমার সিপাহিরা পথ চেনে না, বরকন্দাজেরা পথ চেনে। সুতরাং তাহাদের ধরা সিপাহির সাধ্য নহে।' কাজেই সাহেব সে অভিপ্রায় পরিত্যাগ করিলেন। বলিলেন, 'যাক্ উহাদের চাই না। যে-কথা হইতেছিল, তাই হৌক—তোমরা সকলে ধরা দিবে?'

রঙ্গ। একজনও না। কেবল রানি।

সাহেব। পিস্! এখন আর লড়াই করিবে কে? এই যে কয়জন, তাহারা কি আর পাঁচশো সিপাহির সঙ্গে লড়াই করিতে পারিবে? তোমার বরকন্দাজ সেনা তো জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল, দেখিতেছি।

রঙ্গরাজ দেখিল, বাস্তবিক ভবানী ঠাকুরের সেনা জঙ্গলের ভিতর প্রবেশ করিল।

রঙ্গরাজ বলিল, 'আমি অত জানি না। আমায় আমাদের প্রভু যা বলিয়াছেন, তাহাই বলিতেছি। বজরা পাইবেন না, বজরার যে ধন তাহা পাইবেন না, আমাদের কাহাকেও পাইবেন না। কেবল রানিকে পাইবেন।'

সা। কেন?

রঙ্গ। তা জানি না।

সা। জানো আর নাই জানো, বজরা এখন আমার, আমি উহা দখল করিব।

রঙ্গ। সাহেব বজরাতে উঠিও না, বজরা ছুঁইও না, বিপদ্ ঘটিবে।

সা। পুঃ! পাঁচশো সিপাহি লইয়া তোমাদের জন দুই-চা'রি লোকের কাছে বিপদ!

এই বলিয়া সাহেব শাদা নিশান ফেলিয়া দিলেন। সিপাহিদের হুকুম দিলেন, 'বজরা ঘেরাও কর।'

সিপাহিরা পাঁচখানা ছিপসমেত বজরা ঘেরিয়া ফেলিল। তখন সাহেব বলিলেন, 'বজরার উপর উঠিয়া বরকন্দাজদিগের অস্ত্র কাড়িয়া লও।'

এ হুকুম সাহেব উচ্চৈঃস্বরে দিলেন। কথা দেবীর কানে গেল। দেবীও বজরার ভিতর হইতে উচ্চৈঃস্বরে হুকুম দিলেন, 'বজরায় যাহার যাহার হাতে হাতিয়ার আছে, সব জলে ফেলিয়া দাও।'

শুনিবামাত্র, বজরায় যাহার যাহার হাতে অস্ত্র ছিল, সব জলে ফেলিয়া দিল। রঙ্গরাজও আপনার অস্ত্র সকল জলে ফেলিয়া দিল। দেখিয়া সাহেব সন্তুষ্ট হইলেন, বলিলেন, 'চল, এখন বজরায় গিয়া দেখি, কী আছে।'

রঙ্গ। সাহেব, আপনি জোর করিয়া বজরায় যাইতেছেন, আমার দোষ নাই।

সা। তোমার আবার দোষ কী?

এই বলিয়া সাহেব একজন মাত্র সিপাহি সঙ্গে লইয়া সশস্ত্রে বজরায় উঠিলেন। এটা বিশেষ সাহসের কাজ নহে; কেননা, বজরার উপর যে কয়জন লোক ছিল, তাহারা সকলেই অস্ত্র ত্যাগ করিয়াছে। সাহেব বুঝেন নাই যে, দেবীর স্থিরবুদ্ধিই শাণিত মহাস্ত্র; তার অন্য অস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

সাহেব রঙ্গরাজের সঙ্গে কামরার দরজায় আসিলেন। দ্বার তৎক্ষণাৎ মুক্ত হইল। উভয়ে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে দুইজনেই বিস্মিত হইলেন।

দেখিলেন, যেদিন প্রথমে ব্রজেশ্বর বন্দি হইয়া এই ঘরে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেদিন যেমন ইহার মনোহর সজ্জা, আজিও সেইরূপ; দেয়ালে তেমনি চারুচিত্র। তেমনি সুন্দর গালিচা পাতা। তেমনি আতরদান, গোলাবপাশ, তেমনি সোনার পুষ্পপাত্রে ফুল ভরা, সোনার আলবোলায় তেমনি মৃগনাভিগন্ধি তামাকু সাজা। তেমনি রুপার পুতুল, রুপার ঝাড়, সোনার শিকলে দোলানো সোনার প্রদীপ। কিন্তু আজ একটা মসনদ নয়—দুইটা। দুইটা মসনদের উপর সুবর্ণমণ্ডিত উপাধানে দেহ রক্ষা করিয়া দুইটি সুন্দরী রহিয়াছে। তাহাদের পরিধানে মহার্ঘ বস্ত্র, সর্বাঙ্গে মহামূল্য রত্নভূষা। সাহেব তাদের চেনে না—রঙ্গরাজ চিনিল। চিনিল যে, একজন নিশি—আর একজন দিবা।

সাহেবের জন্য একখানা রুপার চৌকি রাখা হইয়াছিল, সাহেব তাহাতে বসিলেন। রঙ্গরাজ খুঁজিতে লাগিলেন, দেবী কোথা? দেখিলেন, কামরার একধারে দেবীর সহজ বেশে দেবী দাঁড়াইয়া আছে—গড়া পরা, কেবল কড় হাতে, এলোচুল, কোনো বেশভূষা নাই।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে দেবী চৌধুরানি? কাহার সঙ্গে কথা কহিব?'

নিশি বলিল, 'আমার সঙ্গে কথা কহিবেন। আমি দেবী।'

দিবা হাসিল, বলিল, 'ইংরেজ দেখিয়া রঙ্গ করিতেছিস্? এ কি রঙ্গের সময়? লেফটেনান্ট সাহেব! আমার এ ভগিনী কিছু রঙ্গ-তামাশা ভালোবাসে, কিন্তু এ তার সময় নয়। আপনি আমার সঙ্গে কথা কহিবেন—আমি দেবী চৌধুরানি।'

নিশি বলিল, 'আ মরণ! তুই কি আমার জন্য ফাঁসি যেতে চাস্ নাকি? সাহেবের দিকে ফিরিয়া নিশি বলিল, 'সাহেব, ও আমার ভগিনী—বোধহয়, স্নেহবশত আমাকে রক্ষা করিবার জন্য আপনাকে প্রতারণা করিতেছে। কিন্তু কেমন করিয়া মিথ্যা প্রবঞ্চনা করিয়া, বহিনের প্রাণদণ্ড করিয়া, আপনার প্রাণ রক্ষা করিব? প্রাণ অতি তুচ্ছ, আমরা বাঙালির মেয়ে, অক্লেশে ত্যাগ করিতে পারি। চলুন, আমাকে কোথায় লইয়া যাইবেন, যাইতেছি। আমিই দেবী রানি।'

দিবা বলিল, 'সাহেব! তোমার যিশুখ্রিস্টের দিব্য, তুমি যদি নিরপরাধিনীকে ধরিয়া লইয়া যাও। আমি দেবী।'

সাহেব বিরক্ত হইয়া রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'এ কী তামাশা? কে দেবী চৌধুরানি, তুমি যথার্থ বলিবে?'

রঙ্গরাজ কিছু বুঝিল না, কেবল অনুভব করিল যে, ভিতরে একটা কী কৌশল আছে। অতএব বুদ্ধি খাটাইয়া সে নিশিকে দেখাইয়া, হাতজোড় করিয়া বলিল, 'হুজুর! এ-ই যথার্থ দেবী রানি।'

তখন দেবী প্রথম কথা কহিল। বলিল, 'আমার ইহাতে কথা কহা বড় দোষ। কিন্তু কী জানি, এর পর মিছা কথা ধরা পড়িলে, যদি সকলে মারা যায়—, তাই বলিতেছি, এ ব্যক্তি যাহা বলিতেছে তাহা সত্য নহে।' পরে নিশিকে দেখাইয়া বলিল, 'এ দেবী নহে। যে উহাকে দেবী বলিয়া পরিচয় দিতেছে, সে রানিজিকে মা বলে, রানিজিকে মা'র মতো ভক্তি করে, এইজন্য সে রানিজিকে বাঁচাইবার জন্য অন্য ব্যক্তিকে নিশান দিতেছে।'

তখন সাহেব দেবীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'দেবী তবে কে?'

দেবী বলিল, 'আমি দেবী।'

দেবী এই কথা বলিলে নিশিতে, দিবাতে, রঙ্গরাজ ও দেবীতে বড় গণ্ডগোল বাধিয়া গেল। নিশি বলে, 'আমি দেবী।' দিবা বলে, 'আমি দেবী,' রঙ্গরাজ নিশিকে বলে, 'এই দেবী', দেবী বলে, 'আমি দেবী।' বড় গোলমাল।

তখন লেফটেনান্ট সাহেব মনে করিলেন, এ ফেরেববাজির একটা চূড়ান্ত করা উচিত। বলিলেন, 'তোমাদের দুইজনের মধ্যে একজন দেবী চৌধুরানি বটে। ওটা চাকরানি, ওটা দেবী নহে। এই দুইজনের মধ্যে কে সে পাপিষ্ঠা, তাহা তোমরা চাতুরি করিয়া আমাকে জানিতে দিতেছ না। কিন্তু তাহাতে তোমাদের অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে না। আমি এখন দুইজনকেই ধরিয়া লইয়া যাইব। ইহার পর প্রমাণের দ্বারা যে দেবী চৌধুরানি বলিয়া সাব্যস্ত হইবে সেই ফাঁসি যাইবে। যদি প্রমাণের দ্বারা এ কথা-পরিষ্কার না হয়, তবে দুইজনেই ফাঁসি যাইবে।'

তখন নিশি ও দিবা দুইজনেই বলিল, 'এত গোলযোগে কাজ কী? আপনার সঙ্গে কি গোইন্দা নাই? যদি গোইন্দা থাকে, তবে তাহাকে ডাকাইলেই তো সে বলিয়া দিতে পারিবে কে যথার্থ দেবী চৌধুরানি।'

হরবল্লভকে বজরায় আনিবে, দেবীর এই প্রধান উদ্দেশ্য। হরবল্লভের রক্ষার ব্যবস্থা না করিয়া, দেবী আত্মরক্ষার উপায় করিবে না, ইহা স্থির। তাঁহাকে বজরায় না আনিতে পারিলে হরবল্লভের রক্ষার নিশ্চয়তা হয় না।

সাহেব মনে করিলেন, 'এ পরামর্শ মন্দ নহে।' তখন তাঁহার সঙ্গে যে সিপাহি আসিয়াছিল, তাহাকে বলিলেন, 'গোইন্দাকে ডাকো।' সিপাহি এক ছিপের একজন জমাদ্দার সাহেবকে ডাকিয়া বলিল, 'গোইন্দাকে ডাকো।' তখন গোইন্দাকে ডাকাডাকির গোল পড়িয়া গেল। গোইন্দা কোথায়, গোইন্দা কে, তাহা কেহই জানে না, কেবল চারিদিকে ডাকাডাকি করে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বস্তুত হরবল্লভ রায় মহাশয় যুদ্ধক্ষেত্রেই উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্বক নহে, ঘটনাধীন। প্রথমে বড় ঘেঁষেন নাই। 'শৃঙ্গিণাং শস্ত্রপাণিনাং' ইত্যাদি চাণক্যপ্রদত্ত সদুপদেশ স্মরণ করিয়া তিনি সিপাহিদিগের ছিপে উঠেন নাই। একখানা পৃথক ডিঙিতে থাকিয়া, লেফটেনান্ট সাহেবকে বজরা দেখাইয়া দিয়া, অর্ধ ক্রোশ দূরে পলাইয়া গিয়া ডিঙি ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন। তারপর দেখিলেন, আকাশে বড় ঘনঘটা। মনে করিলেন, 'ঝড় উঠিবে ও এখনই আমার ডিঙি ডুবিয়া যাইবে। টাকার লোভে আসিয়া আমি প্রাণ হারাইব—আমার সৎকারও হইবে না।' তখন রায় মহাশয় ডিঙি হইতে তীরে অবতরণ করিলেন। কিন্তু তীরে সেখানে কেহ কোথাও নাই দেখিয়া বড় ভয় হইল। সাপের ভয়, বাঘের ভয়, চোর-ডাকাইতের ভয়, ভূতেরও ভয়। হরবল্লভের মনে হইল, কেন এমন ঝকমারি করিতে আসিয়াছিলাম। হরবল্লভের কান্না আসিল।

এমন সময়ে হঠাৎ বন্দুকের হুড়মুড়ি, সিপাহি বরকন্দাজের হৈহৈ শব্দ সব বন্ধ হইয়া গেল। হরবল্লভের বোধ হইল, অবশ্য সিপাহির জয় হইয়াছে, ডাকাইত মাগী ধরা পড়িয়াছে, নহিলে লড়াই বন্ধ হইবে কেন? তখন হরবল্লভ ভরসা পাইয়া যুদ্ধস্থানে যাইতে অগ্রসর হইলেন। তবে এ রাত্রিকালে, এ অন্ধকারে, এ বনজঙ্গলের মাঝে অগ্রসর হন কিরূপে? ডিঙির মাঝিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'হাঁ বাপু

মাঝি, বলি, ওদিকে যাওয়া যায় কিরূপে বলতে পার?'

মাঝি বলিল, 'যাওয়ার ভাবনা কী? ডিঙিতে উঠুন না, নিয়ে যাচ্ছি। সিপাহিরা মারবে ধরবে না তো? আবার যদি লড়াই বাধে?'

হর। সিপাহিরা আমাদের কিছু বলিবে না। লড়াই আর বাধিবে না—ডাকাইত ধরা পড়েছে। কিন্তু যেরকম মেঘ করেছে, এখনই ঝড় উঠবে—ডিঙিতে উঠি কিরূপে?

মাঝি বলিল, 'ঝড়ে ডিঙি কখনো ডুবে না।'

হরবল্লভ প্রথমে সে-সকল কথায় বিশ্বাস করিলেন না—শেষ অগত্যা ডিঙিতে উঠিলেন। মাঝিকে উপদেশ দিলেন, কেনারায় কেনারায় ডিঙি লইয়া যাইবে। মাঝি তাহাই করিল। শীঘ্র আসিয়া ডিঙি বজরায় লাগিল। হরবল্লভ সিপাহিদের সঙ্কেতবাক্য জানিতেন, সুতরাং সিপাহিরা আপত্তি করিল না। সেই সময়ে 'গোইন্দা! গোইন্দা'! করিয়া ডাকাডাকি হইতেছিল। হরবল্লভ বজরায় উঠিয়া সম্মুখস্থ আরদালির সিপাহিকে বলিল, 'গোইন্দাকে খুঁজিতেছ? আমি গোইন্দা।'

সিপাহি বলিল, 'তোমাকে কাপ্তেন সাহেব তলব করিয়াছেন।'

হর। কোথায় তিনি?

সিপা। কামরার ভিতর। তুমি কামরার ভিতর যাও।

হরবল্লভ আসিতেছে জানিতে পারিয়া দেবী প্রস্থানের উদ্যোগ দেখিল। 'কাপ্তেন সাহেবের জন্য কিছু জলযোগের উদ্যোগ দেখি' বলিয়া ভিতরের কামরায় চলিয়া গেল।

এদিকে হরবল্লভ কামরার দিকে গেলেন। কামরার দ্বারে উপস্থিত হইয়া কামরার সজ্জা ও ঐশ্বর্য, দিবা ও নিশির রূপ ও সজ্জা দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইলেন। সাহেবকে সেলাম করিতে গিয়া, ভুলিয়া নিশিকে সেলাম করিয়া ফেলিলেন। হাসিয়া নিশি কহিল, 'বন্দেগি খাঁ সাহেব! মেজাজ শরিফ?'

শুনিয়া দিবা বলিল, 'বন্দেগি খাঁ সাহেব! আমায় একটা কুরনিশ হল না—আমি হলেম এদের রানি।'

সাহেব হরবল্লভকে বলিলেন, 'ইহারা ফেরেব করিয়া দুইজনেই বলিতেছে, 'আমি দেবী চৌধুরানি।' কে দেবী চৌধুরানি, তাহার ঠিকানা না হওয়ায়, আমি তোমাকে ডাকিয়াছি। কে দেবী?'

হরবল্লভ বড় প্রমাদে পড়িলেন। ঊর্ধ্ব চতুর্দশ পুরুষের ভিতর কখনো দেবীকে দেখেন নাই। কী করেন, ভাবিয়া চিন্তিয়া নিশিকে দেখাইয়া দিলেন। নিশি খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। অপ্রতিভ হইয়া, 'ভুল হইয়াছে' বলিয়া হরবল্লভ দিবাকে দেখাইলেন। দিবা লহর তুলিয়া হাসিল। বিষণ্ণ মনে হরবল্লভ আবার নিশিকে দেখাইল। সাহেব তখন গরম হইয়া উঠিয়া হরবল্লভকে বলিলেন, 'টোম্ বড়্জাট্—শূওর! তোম্ পছান্টে নেহি?'

তখন দিবা বলিল, 'সাহেব, রাগ করিবেন না। উনি চেনেন না। উঁহার ছেলে চেনে। উঁহার ছেলে বজরার ছাদে বসিয়া আছে, তাহাকে আনুন—সে চিনিবে।'

হরবল্লভ আকাশ হইতে পড়িল, বলিল, 'আমার ছেলে!'

দিবা। এইরূপ শুনি।

হর। ব্রজেশ্বর?

দিবা। তিনিই।

হর। কোথা?

দিবা। ছাদে।

হর। ব্রজ এখানে কেন?

দিবা। তিনি বলিবেন।

সাহেব হুকুম দিলেন, 'তাহাকে আনো।'

দিবা রঙ্গরাজকে ইঙ্গিত করিল। তখন রঙ্গরাজ ছাদে গিয়া ব্রজেশ্বরকে বলিল, 'চল, দিবা ঠাকুরানির হুকুম।'

ব্রজেশ্বর নামিয়া কামরার ভিতর আসিল। দেবীর হুকুম আগেই প্রচার হইয়াছিল, দিবার হুকুম পাইলেই ব্রজেশ্বর ছাদ হইতে নামিবে। এমনই দেবীর বন্দোবস্ত।

সাহেব ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি দেবী চৌধুরানিকে চেনো?'

ব্রজ। চিনি।

সাহেব। এখানে দেবী আছে?

ব্রজ। না।

সাহেব তখন রাগান্ধ হইয়া বলিলেন, 'সে কী! ইহারা দুইজনের একজনও দেবী চৌধুরানি নয়?'

ব্র। এরা তার দাসী।

সা। এঃ! তুমি দেবীকে চেনো?

ব্র। বিলক্ষণ চিনি।

সা। যদি এরা কেহ দেবী না হয়, তবে দেবী অবশ্য এ বজরার কোথাও লুকাইয়া আছে। বোধহয়, দেবী সেই চাকরানিটা। আমি বজরা তল্লাশি করিতেছি—তুমি নিশানদিহি করিবে, আইস।

ব্র। সাহেব, তোমার বজরা তল্লাশ করিতে হয়, কর—আমি নিশানদিহি করিব কেন?

সাহেব বিস্মিত হইয়া গর্জিয়া বলিল, 'কেঁও বদ্‌জাত? তোম্ গোইন্দা নেহি?'

'নেহি।' বলিয়া ব্রজেশ্বর সাহেবের গালে বিরাশি সিক্কার এক চপেটাঘাত করিল।

'করিলে কী? করিলে কী? সর্বনাশ করিলে?' বলিয়া হরবল্লভ কাঁদিয়া উঠিল।

'হুজুর! তুফান উঠা।' বলিয়া বাহির হইতে জমাদ্দার হাঁকি শোঁ-শোঁ করিয়া আকাশপ্রান্ত হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু গর্জন করিয়া আসিতেছে শুনা গেল।

কামরার ভিতর হইতে ঠিক সেই মুহূর্তে—যে মুহূর্তে সাহেবের গালে ব্রজেশ্বরের চড় পড়িল—ঠিক সেই মুহূর্তে আবার শাঁক বাজিল। এবার দুই ফুঁ।

বজরার নোঙর ফেলা ছিল না—পূর্বেই বলিয়াছি, খোঁটায় কাছি বাঁধা ছিল, খোঁটার কাছে দুইজন নাবিক বসিয়াছিল। যেমন শাঁক বাজিল, অমনি তাহারা কাছি ছাড়িয়া দিয়া লাফাইয়া বজরায় উঠিল। তীরের উপরে যে-সিপাহিরা বজরা ঘেরাও করিয়াছিল, তাহারা উহাদিগকে মারিবার জন্য সঙিন উঠাইল—কিন্তু তাহাদের হাতের বন্দুক হাতেই রহিল, ফলক ফেলিতে-না-ফেলিতে একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হইয়া গেল। দেবীর কৌশলে এক পলক মধ্যে সেই পাঁচশত কোম্পানির সিপাহি পরাস্ত হইল।

পূর্বেই বলিয়াছি যে, প্রথমাবধিই বজরায় চারিখানা পাল খাটানো ছিল। বলিয়াছি যে, মধ্যে নিশি ও দিবা আসিয়া, নাবিকদিগকে কী উপদেশ দিয়া গিয়াছিল। সেই উপদেশ অনুসারেই খোঁটার কাছে লোক বসিয়াছিল। আর সেই উপদেশ অনুসারে পালের কাছির কাছে চারিজন নাবিক বসিয়াছিল। শাঁকের শব্দ শুনিবামাত্র তাহারা পালের কাছি সকল টানিয়া ধরিল। মাঝি হাল আঁটিয়া ধরিল। অমনি সেই প্রচণ্ড বেগশালী ঝটিকা আসিয়া চারিখানা পালে লাগিল। বজরা ঘুরিল—যে দুইজন সিপাহি সঙিন তুলিয়াছিল, তাহাদের সঙিন উঁচু হইয়া রহিল—বজরার মুখ পঞ্চাশ হাত তফাতে গেল। বজরা ঘুরিল—তার পর ঝড়ের বেগে পালভরা বজরা কাত হইল, প্রায় ডুবে। লিখিতে এতক্ষণ লাগিল—কিন্তু এতখানা ঘটিল এক নিমেষের মধ্যে। সাহেব ব্রজেশ্বরের চড়ের প্রত্যুত্তরে ঘুসি উঠাইয়াছেন মাত্র, ইহারই মধ্যে এতখানা সব হইয়া গেল। তাঁহারও হাতের ঘুসি হাতে রহিল, যেমন বজরা কাত হইল, অমনি সাহেব টলিয়া মুষ্টিবদ্ধহস্তে দিবা সুন্দরীর পাদমূলে পতিত হইলেন। ব্রজেশ্বর খোদ সাহেবের ঘাড়ের উপর পড়িয়া গেল—এবং রঙ্গরাজ তাহার উপর পড়িয়া গেল। হরবল্লভ প্রথমে নিশিঠাকুরানির ঘাড়ের উপর পড়িয়াছিলেন, পরে সেখান হইতে পদচ্যুত হইয়া গড়াইতে গড়াইতে রঙ্গরাজের নাগরা-জুতায় আটকাইয়া গেলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, 'নৌকাখানা ডুবিয়া গিয়াছে, আমরা সকলে মরিয়া গিয়াছি, এখন আর দুর্গানাম জপিয়া কী হইবে!'

কিন্তু নৌকা ডুবিল না—কাত হইয়া আবার সোজা হইয়া বাতাসে পিছন করিয়া বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল। যাহারা পড়িয়া গিয়াছিল, তাহারা আবার খাড়া হইয়া দাঁড়াইল—সাহেব আবার ঘুসি তুলিলেন। কিন্তু সাহেবের ফৌজ, যাহারা জলে দাঁড়াইয়াছিল, বজরা তাহাদের ঘাড়ের উপর দিয়া চলিয়া গেল। অনেকে জলে ডুবিয়া প্রাণরক্ষা করিল; কেহ দূর হইতে বজরা ঘুরিতেছে দেখিতে পাইয়া পলাইয়া বাঁচিল; কেহ বা আহত হইল; কেহ মরিল না। ছিপগুলি বজরার নিচে পড়িয়া ডুবিয়া গেল—জল সেখানে এমন বেশি

নহে—স্রোত বড় নাই—সুতরাং সকলেই বাঁচিল। কিন্তু বজরা আর কেহ দেখিতে পাইল না। নক্ষত্রবেগে উঠিয়া বজরা কোথায় ঝড়ের সঙ্গে মিশিয়া চলিল, কেহ আর দেখিতে পাইল না। সিপাহি সেনা ছিন্নভিন্ন হইল। দেবী তাহাদের পরাস্ত করিয়া পাল উড়াইয়া চলিল, লেফটেনান্ট সাহেব ও হরবল্লভ দেবীর নিকট বন্দি হইল। নিমেষমধ্যে যুদ্ধ জয় হইল। দেবী তাই আকাশ দেখিয়া বলিয়াছিল, 'আমার রক্ষার উপায় ভগবান করিতেছেন।'

অষ্টম পরিচ্ছেদ

বজরা জলের রাশি ভাঙিয়া, দুলিতে দুলিতে নক্ষত্র-বেগে ছুটিল। শব্দ ভয়ানক। বজরার মুখে কৃষ্ণ তরঙ্গরাশির গর্জন ভয়ানক—ঝড়ের শব্দ ভয়ানক। কিন্তু নৌকার গঠন অনুপম, নাবিকদিগের দক্ষতা ও শিক্ষা প্রসিদ্ধ। নৌকা এই ঝড়ের মুখে চারিখানা পাল দিয়া নির্বিঘ্নে চলিল। আরোহিবর্গ যাঁহারা প্রথমে কুষ্মাণ্ডাকারে গড়াগড়ি দিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে স্বপদস্থ হইলেন। হরবল্লভ রায় মহাশয়, অঙ্গুষ্ঠে যজ্ঞোপবীত জড়িত করিয়া দুর্গানাম জপিতে আরম্ভ করিলেন, আবার না ডুবি। লেফটেনান্ট সাহেব সেই মুলতবি ঘুসিটা আবার পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টায় হস্তোত্তোলন করিলেন, অমনি ব্রজেশ্বর তাঁর হাতখানা ধরিয়া ফেলিল। হরবল্লভ ছেলেকে ভর্ৎসনা করিলেন। বলিলেন, 'ও কী কর, ইংরেজের গায়ে হাত তোল?'

ব্রজেশ্বর বলিল, 'আমি ইংরেজের গায়ে হাত তুলেছি, না ইংরেজ আমার গায়ে হাত তুলিতেছে?'

হরবল্লভ সাহেবকে বলিলেন, 'হুজুর! ও ছেলেমানুষ, আজও বুদ্ধিশুদ্ধি হয় নি, আপনি ওর অপরাধ লইবেন না। মাফ করুন।'

সাহেব বলিলেন, 'ও বড় বদমাশ। তবে যদি আমার কাছে জোড়হাত করিয়া মাফ চায় তবে আমি মাফ করিতে পারি।'

হরবল্লভ। ব্রজ, তাই কর। জোড়হাত করিয়া সাহেবকে বল, 'আমায় মাফ করুন।'

ব্রজেশ্বর। সাহেব, আমরা হিন্দু, পিতার আজ্ঞা আমরা কখনো লঙ্ঘন করি না। আমি আপনার কাছে জোড়হাত করিয়া ভিক্ষা করিতেছি, আমাকে মাফ করুন।

সাহেব ব্রজেশ্বরের পিতৃভক্তি দেখিয়া প্রসন্ন হইয়া ব্রজেশ্বরকে ক্ষমা করিলেন, আর ব্রজেশ্বরের হাত লইয়া আচ্ছা করিয়া নাড়িয়া দিলেন। ব্রজেশ্বরের চতুর্দশ পুরুষের মধ্যে কখনো জানে না, শেকহ্যান্ড কাকে বলে—সুতরাং ব্রজেশ্বর একটু ভেকা হইয়া রহিল। মনে করিল, 'কী জানি, যদি আবার বাঁধে।' এই ভাবিয়া ব্রজেশ্বর বাহিরে গিয়া বসিল। কেবল ঝড়—বৃষ্টি বড় নাই—ভিজিতে হইল না।

রঙ্গরাজ বাহিরে আসিয়া, কামরার দ্বার বন্ধ করিয়া দ্বারে পিঠ দিয়া বসিল—দুই দিকের পাহারায়। বিশেষ, এ সময়ে বাহিরে একটু সতর্ক থাকা ভালো, বজরা বড় তীরবেগে যাইতেছে, হঠাৎ বিপদ্‌ ঘটাও বিচিত্র নহে।

দিবা উঠিয়া দেবীর কাছে গেল—পুরুষমহলে এখন আর প্রয়োজন নাই। নিশি উঠিল না—তার কিছু মতলব ছিল। সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে অর্পিত—সুতরাং অগাধ সাহস।

সাহেব জাঁকিয়া আবার রুপার চৌকিতে বসিলেন, ভাবিতে লাগিলেন, 'ডাকাইতের হাত হইতে কিরূপে মুক্ত হইব? যাহাকে ধরিতে আসিয়াছিলাম, তাহারই কাছে ধরা পড়িলাম—স্ত্রীলোকের কাছে পরাজিত হইলাম, ইংরেজ-মহলে আর কী বলিয়া মুখ দেখাইব? আমার না-ফিরিয়া যাওয়াই ভালো।'

হরবল্লভ আর বসিবার স্থান না পাইয়া নিশিসুন্দরীর মসনদের কাছে বসিলেন। দেখিয়া নিশি বলিল, 'আপনি একটু নিদ্রা যাবেন?'

হর। আজ কি আর নিদ্রা হয়?

নিশি। আজ না হইলে তো আর হইল না।

হর। সে কী?

নিশি। আবার ঘুমাইবার দিন কবে পাইবেন?

হর। কেন!

নিশি। আপনি দেবী চৌধুরানিকে ধরাইয়া দিতে আসিয়াছিলেন?

হর। তা—তা—কী জানো—

নিশি। ধরা পড়িলে দেবীর কী হইত, জানো?

হর। আ—এমন কী—

নিশি। এমন কিছু নয়, ফাঁসি!

হর। তা—না—এই—তা কী জানো—

নিশি। দেবী তোমার কোনো অনিষ্ট করে নাই, বরং ভারি উপকার করিয়াছিল—যখন তোমার জাতি যায়, প্রাণ যায়—তখন তোমায় পঞ্চাশ হাজার টাকা নগদ দিয়া তোমায় রক্ষা করিয়াছিল। তার প্রত্যুপকারে তুমি তাহাকে ফাঁসি দিবার চেষ্টায় ছিলে। তোমার যোগ্য কী দণ্ড বল দেখি?

হরবল্লভ চুপ করিয়া রহিল।

নিশি বলিতে লাগিল, 'তাই বলিতেছিলাম, এই বেলা ঘুমাইয়া লও—আর রাত্রের মুখ দেখিবে না। নৌকা কোথায় যাইতেছে বল দেখি?'

হরবল্লভের কথা কহিবার শক্তি নাই।

নিশি বলিতে লাগিল, 'ডাকিনীর শ্মশান বলিয়া এক প্রকাণ্ড শ্মশান আছে। আমরা যাদের প্রাণে মারি, তাদের সেইখানে লইয়া গিয়া মারি। বজরা এখন সেইখানে যাইতেছে। সেইখানে পৌঁছিলে সাহেব ফাঁসি যাইবে, রানিজির হুকুম হইয়া গিয়াছে। আর তোমায় কী হুকুম হইয়াছে, জানো?

হরবল্লভ কাঁদিতে লাগিল—জোড়হাত করিয়া বলিল, 'আমায় রক্ষা কর।'

নিশি বলিল, 'তোমায় রক্ষা করিবে, এমন পাষণ্ড পামর কে আছে? তোমায় শূলে দিবার হুকুম হইয়াছে।'

হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল। ঝড়ের শব্দ বড় প্রবল; সে কান্নার শব্দ ব্রজেশ্বর শুনিতে পাইল না—দেবীও না। সাহেব শুনিল। সাহেব কথাগুলো শুনিতে পায় নাই—কান্না শুনিতে পাইল। সাহেব ধমকাইল, 'রোও মৎ—উল্লুক। মরনা এক রোজ আলবৎ হ্যায়।'

সে কথা কানে না তুলিয়া, নিশির কাছে জোড়হাত করিয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ কাঁদিতে লাগিল। বলিল, 'হাঁ গা! আমায় কি কেউ রক্ষা করিতে পারে না গা?'

নিশি। তোমার মতো নরাধমকে বাঁচাইয়া কে পাতকগ্রস্ত হইবে? আমদের রানি দয়াময়ী, কিন্তু তোমার জন্য কেহই তাঁর কাছে দয়ার ভিক্ষা করিব না।

হর। আমি লক্ষ টাকা দিব।

নিশি। মুখে আনিতে লজ্জা করে না! পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য এই কৃতঘ্নের কাজ করিয়াছ—আবার লক্ষ টাকা হাঁকো?

হর। আমাকে যা বলিবে, তাই করিব।

নিশি। তোমার মতো লোকের দ্বারা কোনো কাজ হয় যে, তুমি যা বলিব তাই করিবে?

হর। অতি ক্ষুদ্রের দ্বারাও উপকার হয়—ওগো, কী করিতে হইবে বল, আমি প্রাণপণ করিয়া করিব—আমায় বাঁচাও।

নিশি। (ভাবিতে ভাবিতে) তোমার দ্বারাও আমার একটা উপকার হইলে হইতে পারে—তা তোমার মতো লোকের দ্বারা সে উপকার না-হওয়াই ভালো।

হর। তোমার কাছে জোড়হাত করিতেছি—তোমার হাতে ধরিতেছি—

হরবল্লভ বিহ্বল—নিশি ঠাকুরানির বাঁউড়ি-পরা গোলগাল হাতখানি প্রায় ধরিয়া ফেলিয়াছিল আর কী! চতুরা নিশি আগে হাত সরাইয়া লইল—বলিল, 'সাবধান! ও হাত শ্রীকৃষ্ণের গৃহীত। কিন্তু তোমার হাতেপায়ে ধরিয়া কাজ নাই—তুমি যদি এতই কাতর হইয়াছ, তবে তুমি যাতে রক্ষা পাও, আমি তা

করিতে রাজি হইতেছি। কিন্তু তোমায় যা বলিব, তা যে তুমি করিবে, এ বিশ্বাস হয় না। তুমি জুয়াচোর, কৃতঘ্ন, পামর, গোইন্দাগিরি কর—তোমার কথায় বিশ্বাস কী?'

হর। যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিতেছি।

নিশি। তোমার আবার দিব্য? কী দিব্য করিবে?

হর। গঙ্গাজল তামা তুলসী দাও—আমি স্পর্শ করিয়া দিব্য করিতেছি।

নিশি। ব্রজেশ্বরের মাথায় হাত দিয়া দিব্য করিতে পার?

হরবল্লভ গর্জিয়া উঠিল। বলিল, 'তোমাদের যা ইচ্ছা, তাহা কর। আমি তা পারিব না।'

কিন্তু এ তেজ ক্ষণিকমাত্র। হরবল্লভ আবার তখনই হাত কচলাইতে লাগিল—বলিল, 'আর যে দিব্য বল, সেই দিব্য করিব, রক্ষা কর।'

নিশি। আচ্ছা, দিব্য করিতে হইবে না—তুমি আমাদের হাতে আছ। শোন, আমি বড় কুলীনের মেয়ে। আমাদের ঘরে পাত্র জোটা ভার। আমার একটি পাত্র জুটিয়াছিল, (পাঠক জানেন, সব মিথ্যা) কিন্তু আমার ছোট বহিনের জুটিল না। আজিও তাহার বিবাহ হয় নাই।

হর। বয়স কত হইয়াছে?

নিশি। পঁচিশ ত্রিশ।

হর। কুলীনের মেয়ে অমন অনেক থাকে।

নিশি। থাকে, কিন্তু আর তার বিবাহ না হইলে, অঘরে পড়িবে, এমন গতিক হইয়াছে। তুমি আমার বাপের পালটি ঘর। তুমি যদি আমার ভগিনীকে বিবাহ কর, আমার বাপের কুল থাকে। আমিও এই কথা বলিয়া রানিজির কাছে তোমার প্রাণভিক্ষা করিয়া লই।

হরবল্লভের মাথার উপর হইতে পাহাড় নামিয়া গেল। আর একটা বিবাহ বৈ তো নয়—সেটা কুলীনের পক্ষে শক্ত কাজ নয়—তা যতবড় মেয়েই হৌক্ না কেন! নিশি যে-উত্তরের প্রত্যাশা করিয়াছিল, হরবল্লভ ঠিক সেই উত্তর দিল, বলিল, 'এ আর বড় কথা কী? কুলীনের কুল রাখা কুলীনেরই কাজ। তবে একটা কথা এই, আমি বুড়া হইয়াছি, আমার আর বিবাহের বয়স নাই। আমার ছেলে বিবাহ করিলে হয় না?'

নিশি। তিনি রাজি হবেন?

হর। আমি বলিলেই হইবে।

নিশি। তবে আপনি কাল প্রাতে সেই আজ্ঞা দিয়া যাইবেন। তাহা হইলে, আমি পালকি বেহারা আনিয়া আপনাকে বাড়ি পাঠাইয়া দিব। আপনি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করিবেন। আমরা বরের বিবাহ দিয়া বৌ সঙ্গে পাঠাইয়া দিব।

হরবল্লভ হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইল—কোথায় শূলে যায়—কোথায় বৌভাতের ঘটা। হরবল্লভের আর দেরি সয় না। বলিল, 'তবে তুমি গিয়া রানিজিকে এ সকল কথা জানাও।'

নিশি বলিল, 'চলিলাম।' নিশি দ্বিতীয় কামরার ভিতর প্রবেশ করিল।

নিশি গেলে, সাহেব হরবল্লভকে জিজ্ঞাসা করিল, 'স্ত্রীলোকটা তোমাকে কী বলিতেছিল?'

হর। এমন কিছুই না।

সাহেব। কাঁদিতেছিলে কেন?

হর। কই? কাঁদি নাই।

সাহেব। বাঙালি এমনই মিথ্যাবাদী বটে।

নিশি ভিতরে আসিলে দেবী জিজ্ঞাসা করিল, 'আমার শ্বশুরের সঙ্গে এত কী কথা কহিতেছিলে?'

নিশি। দেখিলাম, যদি তোমার শাশুড়িগিরিতে বাহাল হইতে পারি।

দেবী। নিশি ঠাকুরানি! তোমার মন প্রাণ, জীবন যৌবন সর্বস্ব শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করিয়াছ—কেবল জুয়াচুরিটুকু নয়। সেটুকু নিজের ব্যবহারের জন্য রাখিয়াছ।

নিশি। দেবতাকে ভালো সামগ্রীই দিতে হয়। মন্দ সামগ্রী কি দিতে আছে?

দেবী। তুমি নরকে পচিয়া মরিবে।

নবম পরিচ্ছেদ

ঝড় থামিল ; নৌকাও থামিল। দেবী বজরার জানেলা হইতে দেখিতে পাইলেন, প্রভাত হইতেছে। বলিলেন, 'নিশি ! আজ সুপ্রভাত !'

নিশি বলিল, 'আমি আজ সুপ্রভাত !'

দিবা। তুমি অবসান, আমি সুপ্রভাত !

নিশি। যেদিন আমার অবসান হইবে, সেইদিনই আমি সুপ্রভাত বলিব। এ অন্ধকারের অবসান নাই। আজ বুঝিলাম, দেবী চৌধুরানির সুপ্রভাত—কেননা, আজ দেবী চৌধুরানির অবসান !

দিবা। ও কী কথা লো পোড়ারমুখী ?

নিশি। কথা ভালো। দেবী মরিয়াছে। প্রফুল্ল শ্বশুরবাড়ি চলিল।

দেবী। তার এখন দেরি ঢের। যা বলি, কর দেখি। বজরা বাঁধিতে বল দেখি।

নিশি হুকুম জারি করিল—মাঝিরা তীরে লাগাইয়া বজরা বাঁধিল। তারপর দেবী বলিল, 'রঙ্গরাজকে জিজ্ঞাসা কর, কোথায় আসিয়াছি ? রঙ্গপুর কত দূর ? ভূতনাথ কত দূর ?'

রঙ্গরাজ জিজ্ঞাসায় বলিল, 'এক রাত্রে চারিদিনের পথ আসিয়াছি ? রঙ্গপুর এখান হইতে অনেক দিনের পথ। ডাঙা-পথে ভূতনাথে একদিনে যাওয়া যাইতে পারে।'

'পালকি বেহারা পাওয়া যাইবে ?'

'আমি চেষ্টা করিলে সব পাওয়া যাইবে।'

দেবী নিশিকে বলিল, 'তবে আমার শ্বশুরকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দাও।'

দিবা। এত তাড়াতাড়ি কেন ?

নিশি। শ্বশুরের ছেলে সমস্ত রাত্রি বাহিরে বসিয়া আছে, মনে নাই ? বাছাধন সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আসিতে পারিতেছে না, দেখিতেছ না ?

এই বলিয়া নিশি রঙ্গরাজকে ডাকিয়া, হরবল্লভের সাক্ষাতে বলিল, 'সাহেবটাকে ফাঁসি দিতে হইবে। ব্রাহ্মণটাকে এখন শূলে দিয়া কাজ নাই। উহাকে পাহারাবন্দি করিয়া স্নানাহ্নিকে পাঠাইয়া দাও।'

হরবল্লভ বলিলেন, 'আমার উপর হুকুম কিছু হইয়াছে ?'

নিশি চোখ টিপিয়া বলিল, 'আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হইয়াছে। তুমি স্নানাহ্নিক করিয়া আইস।'

নিশি রঙ্গরাজের কানে কানে বলিল, 'পাহারা মানে জল-আচরণী ভৃত্য।' রঙ্গরাজ সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া হরবল্লভকে স্নানাহ্নিকে নামাইয়া দিল।

তখন দেবী নিশিকে বলিল, 'সাহেবটাকে ছাড়িয়া দিতে বল। সাহেবকে রঙ্গপুর ফিরিয়া যাইতে বল। রঙ্গপুর অনেক দূর, একশত মোহর উহাকে পথখরচ দাও, নহিলে এত পথ যাইবে কী প্রকারে ?'

নিশি শতস্বর্ণ লইয়া গিয়া রঙ্গরাজকে দিল, আর কানে কানে উপদেশ দিল। উপদেশে দেবী যাহা বলিয়াছিল, তাহা ছাড়া আরো কিছু ছিল।

রঙ্গরাজ তখন দুইজন বরকন্দাজ লইয়া আসিয়া সাহেবকে ধরিল। বলিল, 'উঠ।'

সাহেব। কোথা যাইতে হইবে ?

রঙ্গ। তুমি কয়েদি—জিজ্ঞাসা করিবার কে ?

সাহেব বাক্যব্যয় না করিয়া রঙ্গরাজের পিছু পিছু দুইজন বরকন্দাজের মাঝে চলিল। যে ঘাটে হরবল্লভ স্নান করিতেছিলেন, সেই ঘাট দিয়া তাহারা যায়।

হরবল্লভ জিজ্ঞাসা করিল, 'সাহেবকে কোথায় লইয়া যাইতেছ ?'

রঙ্গরাজ বলিল, 'এই জঙ্গলে।'

হর। কেন ?

রঙ্গ। জঙ্গলের ভিতর গিয়া উহাকে ফাঁসি দিব।

হরবল্লভের গা কাঁপিল। সে সন্ধ্যা-আহ্নিকের সব মন্ত্র ভুলিয়া গেল। সন্ধ্যাহ্নিক ভালো হইল না।

রঙ্গরাজ জঙ্গলে সাহেবকে লইয়া গিয়া বলিল, 'আমরা কাহাকে ফাঁসি দিই না। তুমি ঘরের ছেলে

ঘরে যাও, আমাদের পিছনে আর লেগো না। তোমাকে ছাড়িয়া দিলাম।'

সাহেব প্রথমে বিস্ময়াপন্ন হইল—তারপর ভাবিল, 'ইংরেজকে ফাঁসি দেয়, বাঙালির এত কী ভরসা?'

তারপর রঙ্গরাজ বলিল, 'সাহেব! রঙ্গপুর অনেক পথ, যাবে কী প্রকারে?'

সাহেব। যে প্রকারে পারি।

রঙ্গ। নৌকা ভাড়া কর, নয় গ্রামে গিয়া ঘোড়া কেন—নয় পালকি কর। তোমাকে আমাদের রানি একশত মোহর পথখরচ দিয়াছেন।

রঙ্গরাজ মোহর গণিয়া দিতে লাগিল। সাহেব পাঁচখান মোহর লইয়া আর লইল না। বলিল, 'ইহাতে যথেষ্ট হইবে। এ আমি কর্জ লইলাম।'

রঙ্গরাজ। আচ্ছা, আমরা যদি তোমাদের কাছে আদায় করতে যাই তো শোধ দিও। আর তোমার সিপাহি যদি কেহ জখম হইয়া থাকে, তবে তাহাকে পাঠাইয়া দিও। যদি কেহ মরিয়া থাকে, তবে তাদের ওয়ারেশকে পাঠাইয়া দিও।

সাহেব। কেন?

রঙ্গ। এমন অবস্থায় রানি কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন।

সাহেব বিশ্বাস করিল না। ভালো-মন্দ কিছু না বলিয়া চলিয়া গেল।

রঙ্গরাজ তখন পালকি বেহারার সন্ধানে গেল। তার প্রতি সে আদেশও ছিল।

দশম পরিচ্ছেদ

এদিকে পথ সাফ দেখিয়া, ব্রজেশ্বর ধীরে ধীরে দেবীর কাছে আসিয়া বসিলেন।

দেবী বলিল, 'ভালো হইল, দেখা দিলে। তোমার কথা ভিন্ন আজিকার কাজ হয় না। তুমি প্রাণ রাখিতে হুকুম দিয়াছিলে, তাই প্রাণ রাখিয়াছি। দেবী মরিয়াছে, দেবী চৌধুরানি আর নাই। কিন্তু প্রফুল্ল এখনো আছে। প্রফুল্ল থাকিবে, না দেবীর সঙ্গে যাইবে?'

ব্রজেশ্বর আদর করিয়া প্রফুল্লের মুখচুম্বন করিল। বলিল, 'তুমি আমার ঘরে চল, ঘর আলো হইবে। তুমি না যাও—আমি যাইব না।'

প্রফুল্ল। আমি ঘরে গেলে আমার শ্বশুর কী বলিবেন?

ব্র। সে ভার আমার। তুমি উদ্যোগ করিয়া তাঁকে আগে পাঠাইয়া দাও। আমরা পশ্চাৎ যাইব।

প্র। পালকি বেহারা আনিতে গিয়াছে।

পালকি বেহারা শীঘ্রই আসিল। হরবল্লভও সন্ধ্যাহ্নিক সংক্ষেপে সারিয়া বজরায় আসিয়া উঠিলেন। দেখিলেন, নিশি ঠাকুরানি ক্ষীর, ছানা, মাখন ও উত্তম সুপক্ক আম্র, কদলী প্রভৃতি ফল তাঁহার জলযোগের জন্য সাজাইতেছে। নিশি অনুনয়-বিনয় করিয়া তাঁহাকে জলযোগে বসাইল। বলিল, 'এখন আপনি আমার কুটুম্ব হইলেন; জলযোগ না করিয়া যাইতে পারিবেন না।'

হরবল্লভ জলযোগে না বসিয়া বলিল, 'ব্রজেশ্বর কোথায়? কাল রাত্রে বাহিরে উঠিয়া গেল—আর তাকে দেখি নাই।'

নিশি। তিনি আমার ভগিনীপতি হইবেন—তাঁর জন্য ভাবিবেন না। তিনি এইখানেই আছেন—আপনি জলযোগে বসুন; আমি তাঁহাকে ডাকিয়া দিতেছি। সেই কথাটা তাঁকে বলিয়া যাউন।

হরবল্লভ জলযোগে বসিল। নিশি ব্রজেশ্বরকে ডাকিয়া আনিল। ভিতরের কামরা হইতে ব্রজেশ্বর বাহির হইল দেখিয়া উভয়ে কিছু অপ্রতিভ হইলেন। হরবল্লভ ভাবিলেন, আমার চাঁদপানা ছেলে দেখে, ডাকিনী বেটিরা ভুলে গিয়েছে। ভালোই।

ব্রজেশ্বরকে হরবল্লভ বলিলেন, 'বাপু হে, তুমি যে এখানে কী প্রকারে আসিলে, আমি তো তা এখনও কিছু বুঝিতে পারি নাই। তা যাক—সে এখনকার কথা নয়, সে কথা পরে হবে। এক্ষণে আমি একটু অনুরোধে পড়েছি—তা অনুরোধটা রাখিতে হইবে। এই ঠাকুরানিটি সৎকুলীনের মেয়ে—ওঁর বাপ

আমাদেরই পালটি—তা ওঁর একটি অবিবাহিতা ভগিনী আছে—পাত্র পাওয়া যায় না—কুল যায়। তা কুলীনের কুলরক্ষা কুলীনেরই কাজ—মুটে মজুরের তো কাজ নয়। আর তুমিও পুনর্বার সংসার কর, সেটাও আমার ইচ্ছা বটে, তোমার গর্ভধারিণীরও ইচ্ছা বটে। বিশেষ বড়বউমাটির পরলোকের পর থেকে আমরা কিছু এ বিষয়ে কাতর আছি। তাই বলছিলাম, যখন অনুরোধে পড়া গেছে, তখন এ কর্তব্যই হয়েছে। আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি এঁর ভগিনীকে বিবাহ কর।'

ব্রজেশ্বর মোটের উপর বলিল, 'যে আজ্ঞা।'

নিশির হাসি পাইল, কিন্তু হাসিল না। হরবল্লভ বলিতে লাগিলেন, 'তা আমার পালকি বেহারা এসেছে, আমি আগে গিয়া বৌভাতের উদ্যোগ করি। তুমি যথাশাস্ত্র বিবাহ করে বৌ নিয়ে বাড়ি যেও।'

ব্র। যে আজ্ঞা।

হর। তা তোমায় আর বলিব কী, তুমি ছেলেমানুষ নও—কুল, শীল, জাতি, মর্যাদা, সব আপনি দেখেশুনে বিবাহ করবে। (পরে একটু আওয়াজ খাটো করিয়া বলিতে লাগিলেন) আর আমাদের যেটা পাওনা গণ্ডা, তাও তো জানো?

ব্রজ। যে আজ্ঞা।

হরবল্লভ জলযোগ সমাপন করিয়া বিদায় হইলেন। ব্রজ ও নিশি তাঁহার পদধূলি লইল। তিনি পালকিতে চড়িয়া নিশ্বাস ফেলিয়া দুর্গানাম করিয়া প্রাণ পাইলেন। ভাবিলেন, 'ছেলেটি ডাকিনী বেটিদের হাতে রহিল—তা ভয় নাই। ছেলে আপনার পথ চিনিয়াছে। চাঁদমুখের সর্বত্র জয়।'

হরবল্লভ চলিয়া গেলে, ব্রজেশ্বর নিশিকে জিজ্ঞাসা করিল, 'এ আবার কী হল? তোমার ছোট বোন কে?'

নিশি। চেনো না। তার নাম প্রফুল্ল।

ব্রজ। ওহো! বুঝিয়াছি। কী রকমে এ সম্বন্ধে কর্তাকে রাজি করিলে?

নিশি। মেয়েমানুষের অনেক রকম আছে। ছোটবোনের শাশুড়ি হইতে নাই, নহিলে আরও একটা সম্বন্ধে তাঁকে রাজি করিতে পারিতাম।

দিবা রাগিয়া উঠিয়া বলিল, 'তুমি শিগ্‌গির মর। লজ্জাশরম কিছুই নাই? পুরুষমানুষের সঙ্গে কি অমন করে কথা কহিতে হয়?'

নিশি। কে আবার পুরুষমানুষ? ব্রজেশ্বর? কাল দেখা গিয়াছে—কে পুরুষ, কে মেয়ে।

ব্র। আজিও দেখিবে। তুমি মেয়েমানুষ, মেয়েমানুষের মতো মোটাবুদ্ধির কাজ করিয়াছ। কাজটা ভালো হয় নাই।

নিশি। সে আবার কী?

ব্র। বাপের সঙ্গে কি প্রবঞ্চনা চলে? বাপের চোখে ধূলা দিয়া, মিছে কথা বহাল রাখিয়া আমি স্ত্রী লইয়া সংসার করিব? যদি বাপকে ঠকাইলাম, তবে পৃথিবীতে কার কাছে জুয়াচুরি করিতে আমার আটকাইবে?

নিশি অপ্রতিভ হইল, মনে মনে স্বীকার করিল, ব্রজেশ্বর পুরুষ বটে। কেবল লাঠিবাজিতে পুরুষ হয় না, নিশি তা বুঝিল। বলিল, 'এখন উপায়?'

ব্র। উপায় আছে। চল, প্রফুল্লকে লইয়া ঘরে যাই। সেখানে গিয়া বাপকে সকল কথা ভাঙিয়া বলিব। লুকোচুরি হইবে না।

নিশি। তা হইলে তোমার বাপ কি দেবী চৌধুরানিকে বাড়ি উঠিতে দিবেন?

দেবী বলিল, 'দেবী চৌধুরানি কে? দেবী চৌধুরানি মরিয়াছে, তার নাম এ পৃথিবীতে মুখেও আনিও না। প্রফুল্লের কথা বল।'

নিশি। প্রফুল্লকেই কি তিনি ঘরে স্থান দিবেন?

ব্র। আমি তো বলিয়াছি যে, সে ভার আমার।

প্রফুল্ল সন্তুষ্ট হইল। বুঝিয়াছিল যে, ব্রজেশ্বরের ভার বহিবার ক্ষমতা না থাকিলে সে ভার লইবার লোক নহে।

একাদশ পরিচ্ছেদ

তখন ভূতনাথে যাইবার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। রঙ্গরাজকে সেইখান হইতে বিদায় দিবার কথা স্থির হইল। কেননা, ব্রজেশ্বরের দ্বারবানেরা একদিন তাহার লাঠি খাইয়াছিল, যদি দেখিতে পায়, তবে চিনিবে। রঙ্গরাজকে ডাকিয়া সকল কথা বুঝাইয়া দেওয়া হইল, কতক নিশি বুঝাইল, কতক প্রফুল্ল নিজে বুঝাইল। রঙ্গরাজ কাঁদিল; বলিল, 'মা, আমাদিগকে ত্যাগ করিবেন, তা তো কখনো জানিতাম না।' সকলে মিলিয়া রঙ্গরাজকে সান্ত্বনা করিল। দেবীগড়ে প্রফুল্লের ঘরবাড়ি, দেবসেবা, দেবত্র সম্পত্তি ছিল। সে সকল প্রফুল্ল রঙ্গরাজকে দিলেন, বলিলেন, 'সেইখানে গিয়া বাস কর। দেবতার ভোগ হয়, প্রসাদ খাইয়া দিনপাত করিও। আর কখনো লাঠি ধরিও না। তোমরা যাকে পরোপকার বল, সে বস্তুত পরপীড়ন। ঠেঙ্গা, লাঠির দ্বারা পরোপকার হয় না। দুষ্টের দমন রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন—তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার লইও—কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও। এই সকল কথাগুলি আমার পক্ষ হইতে ভবানী ঠাকুরকেও বলিও; তাঁকে আমার কোটি কোটি প্রণাম জানাইও।'

রঙ্গরাজ কাঁদিতে কাঁদিতে বিদায় হইল। দিবা ও নিশি সঙ্গে সঙ্গে ভূতনাথের ঘাট পর্যন্ত চলিল। সেই বজরায় ফিরিয়া তাহারা দেবীগড়ে গিয়া বাস করিবে, প্রসাদ খাইবে আর হরিনাম করিবে। বজরায় দেবীর রানিগিরির আসবাব সব ছিল, পাঠক দেখিয়াছেন। তাহার মূল্য অনেক টাকা। প্রফুল্ল সব দিবা ও নিশিকে দিলেন। বলিলেন, 'এ সকল বেচিয়া যাহা হইবে, তাহার মধ্যে তোমাদের যাহা প্রয়োজন, ব্যয় করিবে। বাকি দরিদ্রকে দিবে। এ সকল আমার কিছুই নয়—আমি ইহার কিছুই লইব না।' এই বলিয়া প্রফুল্ল আপনার বহুমূল বস্ত্রালঙ্কারগুলি নিশি ও দিবাকে দিলেন।

নিশি বলিল, 'মা! নিরাভরণে শ্বশুরবাড়ি উঠিবে?'

প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে দেখাইয়া দিয়া বলিল, 'স্ত্রীলোকের এই আভরণ সকলের ভালো। আর আভরণে কাজ কী, মা?'

নিশি বলিল, 'আজ তুমি প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাইতেছ; আমি আজ তোমাকে কিছু যৌতুক দিয়া আশীর্বাদ করিব। তুমি মানা করিও না, এই আমার শেষের সাধ—সাধ মিটাইতে দাও।'

এই বলিয়া নিশি কতকগুলি বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে প্রফুল্লকে সাজাইতে লাগিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে, নিশি যখন এক রাজমহিষীর কাছে থাকিত, রাজমহিষী তাহাকে অনেক অলঙ্কার দিয়াছিলেন। এ সেই গহনা। দেবী তাহাকে নূতন গহনা দিয়াছিলেন বলিয়া সেগুলি নিশি পরিত না। এক্ষণে দেবীকে নিরাভরণা দেখিয়া সেইগুলি পরাইল। তারপর আর কোনো কাজ নাই, কাজেই তিনজনে কাঁদিতে বসিল। নিশি গহনা পরাইবার সময়েই সুর তুলিয়াছিল; দিবা তৎক্ষণাৎ পোঁ ধরিলেন। তারপর পোঁ সানাই ছাপাইয়া উঠিল। প্রফুল্লও কাঁদিল—না কাঁদিবার কথা কী? তিনজনের আন্তরিক ভালোবাসা ছিল; কিন্তু প্রফুল্লের মন আহ্লাদে ভরা, কাজেই প্রফুল্ল অনেক নরম গেল। নিশিও দেখিল যে, প্রফুল্লের মন সুখে ভরা; নিশিও সে সুখে সুখী হইল, কান্নায় সেও একটু নরম গেল। সে বিষয়ে যাহার যে ত্রুটি হইল, দিবা ঠাকুরানি তাহা সারিয়া লইলেন।

যথাকালে বজরা ভূতনাথের ঘাটে পৌঁছিল। সেইখানে দিবা ও নিশির পায়ের ধূলা লইয়া, প্রফুল্ল তাহাদিগের কাছে বিদায় লইল। তাহারা কাঁদিতে কাঁদিতে সেই বজরায় ফিরিয়া যথাকালে দেবীগড়ে পৌঁছিল। দাঁড়ী মাঝি বরকন্দাজের বেতন হিসাব করিয়া দিয়া, তাহাদের জবাব দিল। বজরাখানি রাখা অকর্তব্য—চেনা বজরা। প্রফুল্ল বলিয়া দিয়াছিল, 'উহা রাখিও না।' নিশি বজরাখানাকে চেলা করিয়া দুই বৎসর ধরিয়া পোড়াইল।

এই চেলা কাঠের উপঢৌকন দিয়া পাঠকমহাশয় নিশি ঠাকুরানির কাছে বিদায় লউন। অনুপযুক্ত হইবে না।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ভূতনাথের ঘাটে প্রফুল্লের বজরা ভিড়িবামাত্র, কে জানে কোথা দিয়া, গ্রামময় রাষ্ট্র হইল যে, ব্রজেশ্বর আবার একটা বিয়ে করে এনেছে ; বড় নাকি ধেড়ে বৌ। সুতরাং ছেলেবুড়ো, কানা খোঁড়া যে যেখানে ছিল, সব বৌ দেখিতে ছুটিল। যে রাঁধিতেছিল, সে হাঁড়ি ফেলিয়া ছুটিল ; যে মাছ কুটিতেছিল, সে মাছে চুপড়ি চাপা দিয়া ছুটিল ; যে স্নান করিতেছিল, সে ভিজে কাপড়ে ছুটিল। যে খাইতে বসিয়াছিল, তার আধপেটা বৈ খাওয়া হইল না। যে কোন্দল করিতেছিল, শত্রুপক্ষের সঙ্গে হঠাৎ তার মিল হইয়া গেল। যে মাগী ছেলে ঠেঙ্গাইতেছিল, তার ছেলে সে যাত্রা বাঁচিয়া গেল, মা'র কোলে উঠিয়া ধেড়ে বৌ দেখিতে চলিল। কাহারো স্বামী আহারে বসিয়াছেন, পাতে ডাল তরকারি পড়িয়াছে, মাছের ঝোল পড়ে নাই—এমন সময়ে বৌয়ের খবর আসিল, আর তাঁর কপালে সেদিন মাছের ঝোল হইল না। এইমাত্র বুড়ি নাতিনীর সঙ্গে কাজিয়া করিতেছিল যে, 'আমার হাত ধরিয়া না নিয়ে গেলে, আমি কেমন করে পুকুরঘাটে যাই ?' —এমন সময় গোল হইল—'বৌ এসেছে' অমনি নাতিনী আয়ি ফেলিয়া বৌ দেখিতে গেল, আয়িও কোনোরকমে সেইখানে উপস্থিত। এক যুবতী মা'র কাছে তিরস্কার খাইয়া শপথ করিতেছিলেন যে তিনি কখনো বাহির হন না, এমন সময়ে বৌ আসার সংবাদ পৌছিল, শপথটা সম্পূর্ণ হইল না ; যুবতী বৌয়ের বাড়ির দিকে ছুটিলেন। মা শিশু ফেলিয়া ছুটিল, শিশু মা'র পিছু পিছু কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল। ভশুর, স্বামী বসিয়া আছে; ভ্রাতৃবধূ মানিল না, ঘোমটা টানিয়া সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। ছুটিতে যুবতীদের কাপড় খসিয়া পড়ে, আঁটিয়া পরিবার অবকাশ নাই। চুল খুলিয়া পড়ে, জড়াইবার অবকাশ নাই। সামলাইতে কোথাকার কাপড় কোথায় টানেন, তারও বড় ঠিক নাই। হুলস্থূল পড়িয়া গেল। লজ্জায় লজ্জাদেবী পলায়ন করিলেন।

বর-কন্যা আসিয়া পিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়াছে, গিন্নি বরণ করিতেছেন। বৌয়ের মুখ দেখিবার জন্য লোকে ঝুঁকিয়াছে, কিন্তু বৌ বৌগিরির চাল ছাড়ে না, দেড় হাত ঘোমটা টানিয়া রাখিয়াছে, কেহ মুখ দেখিতে পায় না। শাশুড়ি বরণ করিবার সময়ে একবার ঘোমটা খুলিয়া বধূর মুখ দেখিলেন। একটু চমকিয়া উঠিলেন, আর কিছু বলিলেন না, কেবল বলিলেন, 'বেশ বউ।' তাঁর চোখে একটু জল আসিল।

বরণ হইয়া গেলে, বধূ ঘরে তুলিয়া শাশুড়ি সমবেত প্রতিবাসিনীদিগকে বলিলেন, 'মা ! আমার বেটা-বৌ অনেক দূর থেকে আসিতেছে, ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর। আমি এখন ওদের খাওয়াই দাওয়াই। ঘরের বৌ তো ঘরেই রহিল, তোমরা নিত্য দেখবে ; এখন ঘরে যাও, খাও দাও গিয়া।'

গিন্নির এই বাক্যে অপ্রসন্ন হইয়া নিন্দা করিতে করিতে প্রতিবাসিনীরা ঘরে গেল। দোষ গিন্নির, কিন্তু নিন্দাটা বধূরই অধিক হইল ; কেননা, বড় কেহ মুখ দেখিতে পায় নাই। ধেড়ে মেয়ে বলিয়া সকলেই ঘৃণা প্রকাশ করিল। আবার সকলেই বলিল, 'কুলীনের ঘরে অমন ঢের হয়।' তখন যে যেখানে কুলীনের ঘরে বুড়ো বৌ দেখিয়াছে, তার গল্প করিতে লাগিল। গোবিন্দ মুখুয্যা পঞ্চান্ন বৎসরের একটা মেয়ে বিয়ে করিয়াছিল, হরি চাটুয্যা সত্তর বৎসরের এক কুমারী ঘরে আনিয়াছিলেন, মনু বাঁড়ুয্যা একটি প্রাচীনার অন্তর্জলে তাহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন—এইসকল আখ্যায়িকা সালঙ্কারে পথিমধ্যে ব্যাখ্যাত হইতে লাগিল। এইরূপ আন্দোলন করিয়া ক্রমে গ্রাম ঠাণ্ডা হইল।

গোলমাল মিটিয়া গেল ; গিন্নি বিরলে ব্রজেশ্বরকে ডাকিলেন। ব্রজ আসিয়া বলিল, 'কী মা ?'

গিন্নি। বাবা, এ বৌ কোথা পেলে, বাবা ?

ব্রজ। এ নূতন বিয়ে নয়, মা !

গিন্নি। বাবা, এ হারাধন আবার কোথায় পেলে, বাবা ?

গিন্নির চোখে জল পড়িতেছিল।

ব্রজ। মা, বিধাতা দয়া করিয়া আবার দিয়াছেন। এখন মা, তুমি বাবাকে কিছু বলিও না। নির্জনে পাইলে আমি সকলই তাঁর সাক্ষাতে প্রকাশ করিব।

গিন্নি। তোমাকে কিছু বলিতে হইবে না, বাপ, আমিই সব বলিব। বৌভাতটা হইয়া যাক। তুমি কিছু ভাবিও না। এখন কাহারো কাছে কিছু বলিও না।

ব্রজেশ্বর স্বীকৃত হইল। এ কঠিন কাজের ভার মা লইলেন। ব্রজ বাঁচিল। কাহাকে কিছু বলিল না।

পাকস্পর্শ নির্বিঘ্নে হইয়া গেল। বড় ঘটাপটা কিছু হইল না, কেবল জনকতক আত্মীয়স্বজন ও কুটুম্ব নিমন্ত্রণ করিয়া হরবল্লভ কার্য সমাধা করিলেন।

পাকস্পর্শের পর গিন্নি আসল কথাটা হরবল্লভকে ভাঙিয়া বলিলেন। বলিলেন যে, 'এ নূতন বিয়ে নয়—সেই বড়বউ।'

হরবল্লভ চমকিয়া উঠিল—সুপ্ত ব্যাঘ্রকে কে যেন বানে বিঁধিল। 'অ্যাঁ, সেই বড়বউ—কে বললে?'

গিন্নি। আমি চিনেছি। আর ব্রজও আমাকে বলিয়াছে।

হর। সে যে দশ বৎসর হল মরে গেছে।

গিন্নি। মরা মানুষেও কখনো ফিরে থাকে।

হর। এতদিন সে মেয়ে কোথায় কার কাছে ছিল?

গিন্নি। তা আমি ব্রজেশ্বরকে জিজ্ঞাসা করি নাই। জিজ্ঞাসাও করিব না। ব্রজ যখন ঘরে আনিয়াছে, তখন না-বুঝিয়াসুঝিয়া আনে নাই।

হর। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি।

গিন্নি। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। তুমি একবার কথা কহিয়াছিলে, তার ফলে আমার ছেলে আমি হারাইতে বসিয়াছিলাম। আমার একটি ছেলে। আমার মাথা খাও, তুমি একটি কথাও কহিও না। যদি তুমি কোনো কথা কহিবে, তবে আমি গলায় দড়ি দিব।

হরবল্লভ এতটুকু হইয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না। কেবল বলিলেন, 'তবে লোকের কাছে নূতন বিয়ের কথাটাই প্রচার থাক।'

গিন্নি বলিলেন, 'তাই থাকিবে।'

সময়ান্তরে গিন্নি ব্রজেশ্বরকে সুসংবাদ জানাইলেন। বলিলেন, 'আমি তাঁকে বলিয়াছিলাম তিনি কোনো কথা কহিবেন না। সেসব কথার আর কোনো উচ্চবাচ্যে কাজ নাই।'

ব্রজ হৃষ্টচিত্তে প্রফুল্লকে খবর দিল।

আমরা স্বীকার করি, গিন্নি এবার বড় গিন্নিপনা করিয়াছেন। যে সংসারের গিন্নি গিন্নিপনা জানে, সে সংসারে কারো মনঃপীড়া থাকে না। মাঝিতে হাল ধরিতে জানিলে নৌকার ভয় কী?

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

প্রফুল্ল সাগরকে দেখিতে চাহিল। ব্রজেশ্বরের ইঙ্গিত পাইয়া গিন্নি সাগরকে আনিতে পাঠাইলেন। গিন্নিরও সাধ তিনটি বৌ একত্র করেন।

যে লোক সাগরকে আনিতে গিয়াছিল, তাহার মুখে সাগর শুনিল, স্বামী আর একটা বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন—বুড়ো মেয়ে। সাগরের বড় ঘৃণা হইল। 'ছি! বুড়ো মেয়ে!' বড় রাগ হইল, 'আবার বিয়ে? আমরা কি স্ত্রী নই?' দুঃখ হইল, 'হায়! বিধাতা কেন আমায় দুঃখীর মেয়ে করেন নাই। আমি কাছে থাকিতে পারিলে তিনি হয়ত আর বিয়ে করিতেন না।'

এইরূপ রুষ্ট ও ক্ষুণ্নভাবে সাগর শ্বশুরবাড়ি আসিল। আসিয়াই প্রথমে নয়ান-বৌয়ের কাছে গেল। নয়ান-বৌ সাগরের দুই চক্ষের বিষ; সাগর-বৌ, নয়ানেরও তাই। কিন্তু আজ দুইজন এক, দুইজনের এক বিপদ্। তাই ভাবিয়া সাগর আগে নয়নতারার কাছে গেল।

সাপকে হাঁড়ির ভিতর পুরিলে, সে যেমন গর্জিতে থাকে, প্রফুল্ল আসা অবধি নয়নতারা সেইরূপ করিতেছিল। একবার মাত্র ব্রজেশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল—গালির চোটে ব্রজেশ্বর পলাইল, আর আসিল না। প্রফুল্লও ভাব করিতে গিয়াছিল, কিন্তু তারও সেই দশা ঘটিল। স্বামী সপত্নী দূরে থাক, পাড়াপ্রতিবাসীও সে কয়দিন নয়নতারার কাছে ঘেঁষিতে পারে নাই। নয়নতারার কতকগুলি ছেলেমেয়ে হইয়াছিল; তাদেরই বিপদ্ বেশি। এ কয়দিন মার খাইতে খাইতে তাদের প্রাণ বাহির হইয়া গেল।

সেই দেবীর শ্রীমন্দিরে প্রথম সাগর গিয়া দেখা দিলেন। দেখিয়া নয়নতারা বলিল, 'এসো, এসো! তুমি বাকি থাকো কেন? আর ভাগীদার কেউ আছে?'

সাগর। কী! আবার নাকি বিয়ে করেছে?

নয়ন। কে জানে, বিয়ে কি নিকে, তার খবর আমি কি জানি?

সাগর। বামুনের মেয়ের কি আবার নিকে হয়?

নয়ন। বামুন, কি শূদ্র, কি মুসলমান, তা কি আমি দেখতে গেছি?

সাগর। অমন কথাগুলো মুখে এনো না। আপনার জাত বাঁচিয়ে সবাই কথা কয়।

নয়ন। যার ঘরে অতবড় কনে-বৌ এল, তার আবার জাত কী?

সাগর। কতবড় মেয়ে? আমাদের বয়স হবে?

নয়ন। তোর মা'র বয়সী।

সাগর। চুল পেকেছে?

নয়ন। চুল না পাকলে আর রাত্রিদিন বুড়ো মাগী ঘোমটা টেনে বেড়ায়?

সা। দাঁত পড়েছে!

ন। চুল পাক্‌ল, দাঁত আর পড়ে নি?

সা। তবে স্বামীর চেয়ে বয়সে বড় বল?

ন। তবে শুনচিস কী?

সা। তাও কী হয়?

ন। কুলীনের ঘরে এ সব হয়।

সা। দেখতে কেমন?

ন। রূপের ধ্বজা! যেন গালফুলো গোবিন্দের মা।

সা। যে বিয়ে করেছে তাকে কিছু বল নি?

ন। দেখতে পাই কী? দেখতে পেলে হয়। মুড়ো ঝাঁটা তুলে রেখেছি।

সা। আমি তবে সে সোনার প্রতিমাখানা দেখে আসি।

ন। যা, জন্ম সার্থক করগে যা।

নূতন সপত্নীকে খুঁজিয়া সাগর তাহাকে পুকুরঘাটে ধরিল। প্রফুল্ল পিছন ফিরিয়া বাসন মাজিতেছিল। সাগর পিছনে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'হ্যাঁ গা, তুমি আমাদের নূতন বৌ?'

'কে, সাগর এয়েছ?' বলিয়া নূতন বৌ সমুখ ফিরিল।

সাগর দেখিল, কে! বিস্ময়াপন্না হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'দেবী রানি?'

প্রফুল্ল বলিল, 'চুপ! দেবী মরিয়া গিয়াছে।'

সা। প্রফুল্ল?

প্র। প্রফুল্লও মরিয়াছে।

সা। কে তবে তুমি?

প্র। আমি নূতন বৌ।

সা। কেমন করে হল, আমায় সব বল দেখি।

প্র। এখানে বলিবার জায়গা নয়। আমি একটি ঘর পাইয়াছি, সেইখানে চল, সব বলিব।

দুইজনে দ্বার বন্ধ করিয়া, বিরলে বসিয়া কথোপকথন হইল। প্রফুল্ল সাগরকে সব বুঝাইয়া বলিল। শুনিয়া সাগর জিজ্ঞাসা করিল, 'এখন গৃহস্থালিতে কি মন টিকিবে? রূপার সিংহাসনে বসিয়া, হীরার মুকুট পরিয়া, রানিগিরির পর কি বাসনমাজা, ঘরঝাঁট দেওয়া ভালো লাগিবে? যোগশাস্ত্রের পর কী ব্রহ্মঠাকুরানির রূপকথা ভালো লাগিবে? যার হুকুমে দুই হাজার লোক খাটিত; এখন হরির মা, পারির মা'র হুকুমবরদারি কি তার ভালো লাগিবে?'

প্র। ভালো লাগিবে বলিয়াই আসিয়াছি। এই ধর্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম; রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম নয়। কঠিন ধর্মও এই সংসারধর্ম; ইহার অপেক্ষা কোনো যোগই কঠিন নয়। দেখ, কতকগুলি নিরক্ষর,

স্বার্থপর, অনভিজ্ঞ লোক লইয়া আমাদের নিত্য ব্যবহার করিতে হয়। ইহাদের কারো কোনো কষ্ট না হয়, সকলে সুখী হয়, সেই ব্যবস্থা করিতে হইবে। এর চেয়ে কোন্ সন্ন্যাস কঠিন? এর চেয়ে কোন্ পুণ্য বড় পুণ্য? আমি এই সন্ন্যাস করিব।

সা। তবে কিছুদিন আমি তোমার কাছে থাকিয়া তোমার চেলা হইব।

যখন সাগরের সঙ্গে প্রফুল্লের এই কথা হইতেছিল, তখন ব্রহ্মঠাকুরানির কাছে ব্রজেশ্বর ভোজনে বসিয়াছিলেন। ব্রহ্মঠাকুরানি জিজ্ঞাসা করিলেন, 'বেজ, এখন কেমন রাঁধি?'

ব্রজেশ্বরের সেই দশ বছরের কথা মনে পড়িল। কথাগুলি মূল্যবান—তাই দুইজনেরই মনে ছিল।

ব্রজ বলিল, 'বেশ।'

ব্রহ্ম। এখন গোরুর দুধ কেমন? বেগড়ায় কি?

ব্রজ। বেশ দুধ।

ব্রহ্ম। কই, দশ বৎসর হল—আমায় তো গঙ্গায় দিলি না?

ব্রজ। ভুলে গিছিলেম।

ব্রহ্ম। তুই আমায় গঙ্গায় দিস্ নে। তুই বাগদি হয়েছিস্।

ব্রজ। ঠান্‌দিদি! চুপ। ও কথা না।

ব্রহ্ম। তা দিস্, পারিস্ তো গঙ্গায় দিস। আমি আর কথা কব না। কিন্তু ভাই, কেউ যেন আমার চরকা-টরকা ভাঙ্গে না।

চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

কয়েক মাস থাকিয়া সাগর দেখিল, প্রফুল্ল যাহা বলিয়াছিল, তাহা করিল। সংসারের সকলকে সুখী করিল। শাশুড়ি প্রফুল্ল হইতে এত সুখী যে, প্রফুল্লের হাতে সমস্ত সংসারের ভার দিয়া, তিনি কেবল সাগরের ছেলে কোলে করিয়া বেড়াইতেন। ক্রমে শ্বশুরও প্রফুল্লের গুণ বুঝিলেন। শেষ প্রফুল্ল যে কাজ না করিত, সে কাজ তাঁর ভালো লাগিত না। শ্বশুর-শাশুড়ি প্রফুল্লকে না-জিজ্ঞাসা করিয়া কোনো কাজ করিত না, তাহার বুদ্ধিবিবেচনার উপর তাহাদের এতটাই শ্রদ্ধা হইল। ব্রহ্মঠাকুরানিও রান্নাঘরের কর্তৃত্ব প্রফুল্লকে ছাড়িয়া দিলেন। বুড়ি আর বড় রাঁধিতে পারে না, তিন বৌ রাঁধে; কিন্তু যেদিন প্রফুল্ল দুই একখানা না রাঁধিত, সেদিন কাহারো অন্নব্যঞ্জন ভালো লাগিত না। যাহার ভোজনের কাছে প্রফুল্ল না দাঁড়াইত, সে মনে করিত, আধপেটা খাইলাম। শেষ নয়ান-বৌও বশীভূত হইল। আর প্রফুল্লের সঙ্গে কোন্দল করিতে আসিত না। বরং প্রফুল্লের ভয়ে আর কাহারো সঙ্গে কোন্দল করিতে সাহস করিত না। প্রফুল্লের পরামর্শ ভিন্ন কোনো কাজ করিত না। দেখিল, নয়নতারার ছেলেগুলিকে প্রফুল্ল যেমন যত্ন করে, নয়নতারা তেমন পারে না। নয়নতারা প্রফুল্লের হাতে ছেলেগুলি সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হইল। সাগর বাপের বাড়ি অধিক দিন থাকিতে পারিল না—আবার আসিল। প্রফুল্লের কাছে থাকিলে সে যেমন সুখী হইত, এত আর কোথাও হইত না।

এ সকল অন্যের পক্ষে আশ্চর্য বটে, কিন্তু প্রফুল্লের পক্ষে আশ্চর্য নহে। কেননা, প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্ম অভ্যাস করিয়াছিল। প্রফুল্ল সংসারে আসিয়াই যথার্থ সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল। তার কোনো কামনা ছিল না—কেবল কাজ খুঁজিত। কামনা অর্থে আপনার সুখ খোঁজা—কাজ অর্থে পরের সুখ খোঁজা। প্রফুল্ল নিষ্কাম অথচ ধর্মপরায়ণ, তাই প্রফুল্ল যথার্থ সন্ন্যাসিনী। তাই প্রফুল্ল যাহা স্পর্শ করিত, তাই সোনা হইত। প্রফুল্ল ভবানীঠাকুরের শাণিত অস্ত্র—সংসার-গ্রন্থি অনায়াসে বিচ্ছিন্ন করিল। অথচ কেহই হরবল্লভের গৃহে জানিতে পারিল না যে, প্রফুল্ল এমন শাণিত অস্ত্র। সে যে অদ্বিতীয় মহামহোপাধ্যায়ের শিষ্যা—নিজে পরম পণ্ডিত—সে কথা দূরে থাক, কেহ জানিল না যে, তাহার অক্ষর-পরিচয়ও আছে। গৃহধর্মে বিদ্যা প্রকাশের প্রয়োজন নাই। গৃহধর্ম বিদ্বানেই সুসম্পন্ন করিতে পারে বটে, কিন্তু বিদ্যা প্রকাশের স্থান সে নয়। যেখানে বিদ্যা প্রকাশের স্থান নহে, সেখানে যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায়, সেই মূর্খ।

যাহার বিদ্যা প্রকাশ পায় না, সেই যথার্থ পণ্ডিত

প্রফুল্লের যাহা কিছু বিবাদ, সে ব্রজেশ্বরের সঙ্গে। প্রফুল্ল বলিত, 'আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান-বৌয়ের। আমি একা তোমায় ভোগ-দখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতি দেবতা ; তোমাকে ওরা পূজা করিতে পায় না কেন?' ব্রজেশ্বর তা শুনিত না। ব্রজেশ্বরের হৃদয় কেবল প্রফুল্লময়। প্রফুল্ল বলিত, 'আমায় যেমন ভালোবাস, উহাদিগকেও তেমনি ভালো না বাসিলে, আমার উপর তোমার ভালোবাসা সম্পূর্ণ হইল না। ওরাও আমি।' ব্রজেশ্বর তা বুঝিত না।

প্রফুল্লের বিষয়বুদ্ধি, বুদ্ধির প্রাখর্য ও সদ্বিবেচনার গুণে, সংসারের বিষয়কর্মও তাহার হাতে আসিল। তালুক মুলুকের কাজ বাহিরে হইত বটে, কিন্তু একটু কিছু বিবেচনার কথা উঠিলে কর্তা আসিয়া গিন্নিকে বলিতেন, 'নূতন বৌমাকে জিজ্ঞাসা কর দেখি, তিনি কী বলেন?' প্রফুল্লের পরামর্শে সব কাজ হইতে লাগিল বলিয়া, দিনদিন লক্ষ্মীশ্রী বাড়িতে লাগিল। শেষ যথাকালে ধন জন ও সর্বসুখে পরিবৃত হইয়া হরবল্লভ পরলোকে গমন করিলেন।

বিষয় ব্রজেশ্বরের হইল। প্রফুল্লের গুণে ব্রজেশ্বরের নূতন তালুক মুলুক হইয়া হাতে অনেক নগদ টাকা জমিল। তখন প্রফুল্ল বলিল, 'আমার সেই পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ শোধ কর।'

ব্র। কেন, তুমি টাকা লইয়া কী করিবে?

প্র। আমি কিছু করিব না। কিন্তু টাকা আমার নয়—শ্রীকৃষ্ণের ; কাঙ্গাল গরিবের। কাঙ্গাল গরিবকে দিতে হইবে।

ব্র। কী প্রকারে?

প্র। পঞ্চাশ হাজার টাকায় এক অতিথিশালা কর।

ব্রজেশ্বর তাই করিল। অতিথিশালা মধ্যে এক অন্নপূর্ণা-মূর্তি স্থাপন করিয়া অতিথিশালার নাম দিল, 'দেবীনিবাস।'

যথাকালে পুত্র-পৌত্র সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। দেশের লোক সকলেই বলিল, 'আমরা মাতৃহীন হইলাম।'

রঙ্গরাজ, দিবা ও নিশি দেবীগড়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের প্রসাদভোজনে জীবন নির্বাহ করিয়া পরলোক গমন করিলেন। ভবানী ঠাকুরের অদৃষ্টে সেরূপ ঘটিল না।

ইংরেজ রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিল। রাজ্য সুশাসিত হইল। সুতরাং ভবানী ঠাকুরের কাজ ফুরাইল। দুষ্টের দমন রাজাই করিতে লাগিল। ভবানী ঠাকুর ডাকাইতি বন্ধ করিল।

তখন ভবানী ঠাকুর মনে করিল, 'আমার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন'—এই ভাবিয়া ভবানী ঠাকুর ইংরেজকে ধরা দিলেন, সকল ডাকাইতি একরার করিলেন, দণ্ডের প্রার্থনা করিলেন। ইংরেজ হুকুম দিল, 'যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরে বাস।' ভবানী পাঠক প্রফুল্লচিত্তে দ্বীপান্তরে গেল।

এখন এসো, প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র ; কতবার আসিয়াছি, তোমরা আমায় ভুলিয়া গিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—

পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥'

চিরায়ত গ্রন্থমালা

এবং

চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা

শীর্ষক দুটি সিরিজের আওতায়

বাংলাভাষাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ

ও ভাষার শ্রেষ্ঠ রচনাসমূহকে

পাঠক সাধারণের কাছে সহজলভ্য করার লক্ষ্যে

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র

একটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

এই বইটি 'চিরায়ত বাংলা গ্রন্থমালা'র

অন্তর্ভুক্ত।

বইটি আপনার জীবনকে দীপান্বিত করুক।